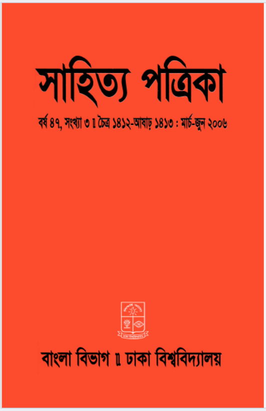

Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনচিত্র : কর্ণফুলী

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.6
Pages	৯৫-১২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জীবনচিত্র : কর্ণফুলী

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ[*]

আলাউদ্দীন আল আজাদ 'কর্ণফুলী'[১] উপন্যাসে 'চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবন কাহিনী[২] উপস্থাপন করেছেন। নদী 'কর্ণফুলী'র জন্ম আসামের লুসাই পাহাড়ে। পাহাড়ী অঞ্চলে এর নাম ক্যিউসা-খিয়্যুং। এই পাহাড়ী নদীটির গতি-প্রকৃতি বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে আলাদা।[৩] উৎপত্তির পর আসাম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি রাঙামাটির উজানে বরকলের কিছু উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে। এর পর দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।[৪] 'কর্ণফুলী' নদী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'চট্টগ্রাম প্রকৃতির লীলাভূমি। ...পাহাড়, প্রান্তর, নদী, ঝর্ণা, হ্রদ, সমুদ্র গিরিপথ বা ডালা এসবের এমন সুন্দর সমাবেশ আর কোথাও এমন হয়েছে কি না সন্দেহ।[৫] 'অনুরূপ বলেছেন অন্য আরও একজন লেখক, 'প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের নদী এই কর্ণফুলী। পাহাড়, প্রান্তর, ঝর্ণা, হ্রদ, গিরিপথ এই এলাকাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। কর্ণফুলী ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী জীবনকে নিয়ে লেখা হয়েছে কতো গল্প কাহিনী।'[৬] কর্ণফুলী নদীকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সাহিত্যকর্ম। সৃষ্ট এ সব সাহিত্যকর্মে চট্টগ্রামের প্রকৃতির মতো সেখানকার মানুষদের জীবনাচরণও স্থান পেয়েছে সমানভাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> চট্টগ্রামের পুবে সীতা পাহাড়। তার মাঝখান দিয়ে কাঁইচা বা কর্ণফুলী নদী বেরিয়ে এসেছে। সেই নদী তীরের গভীর অরণ্যে আছে বাঘ, ভালুক, রামকুকুর, হরিণ ও গয়াল। আছে ঝাঁক-ঝাঁক হাতি, বুনো গরু, ও বন শুয়োর, আরো পুবে, উত্তরে ও পশ্চিমে গেলে আরো অনেক পাহাড়, আরো গভীর অরণ্য। সেখানে বাস করে মারমা, ত্রিপুরা, বনজুগি, পাংখো, মুরং, কুকি ও চাকমারা। বনের জীবজন্তুর সঙ্গে মিলেমিশে তারা থাকে। প্রয়োজনে তারা হিংস্রও হতে জানে।
>
> চাকমা, মারমা, বা মুরংরা জুমচাষ করে। পাহাড়ের ঢালুর গাছপালা কেটে শুকিয়ে আগুন জ্বেলে জমি আবাদ করে। সেই ঢালু বা খাড়া পাহাড়ের জমিতে ধান, সর্ষে, কার্পাস, মারফা, চিনার, আদা, হলুদ, আনারস, কাউন প্রভৃতি চাষ করে। এক পাহাড়ে পর পর দু'-তিন বছর চাষবাস করে, তার পর আবার নতুন পাহাড় আবাদ করে। এভাবে যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে সুখে-দুঃখে-শান্তিতে বাস করে। তারা ক্ষেতের ফসল বেচে সমতলের ব্যবসায়ীদের কাছে। নদীর কূলে সকাল থেকে হাট

---

[*] পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

> বসে। পাহাড়ি নারী-পুরুষ জমির ফসল নিয়ে যায় বেচতে। হাট থেকে তারা কেনে নুন, কেরোসিন, নাপ্পি. শুঁটকি। নাপ্পি হলো কাঁচা মাছ থেকে তৈরি এক রকম পেস্ট। তরকারি ও ভর্তার সঙ্গে খেতে তারা খুব পছন্দ করে।
>
> বনের মানুষগুলো জুমচাষ করতে করতে গান গায়, বুনো ফল তুলে খায়. চৈত্র-সংক্রান্তিতে বিজু উৎসবে মাতে। যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে নাচ-গান করে. মন দেওয়া-নেওয়া করে। তারপর মা বাবার মত নিয়ে বিয়ে করে। প্রায় আকাশ সমান পাহাড়ের ঢালুতে ও মুড়ার ওপর মাচার ওপর ওরা ঘর বাঁধে। সারাদিন পাহাড়ে কাজ করে। দিনের শেষে কাজ থেকে ফেরার সময় বা ঘরে থেকে ঝর্ণা বা ছড়ায় গিয়ে স্নান করে, কাপড় কাচে। পানি নিয়ে যায়, গান গায়। তারপর খায়-দায় আর রোজকার মতো আনন্দ-ফুর্তি করে মাচাঘরে ঘুমোয়।[৭]

উপন্যাসে উপস্থাপিত পাহাড়ীদের জীবন সম্পর্কে জানার জন্যেই ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম যেতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন. 'উপন্যাস লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতেই আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঝে মাঝে যেতাম।'[৮] চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবনের সংগ্রাম-আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-বাস্তবতার ছবি এ উপন্যাস। ''কর্ণফুলী'র জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা'[৯]— জীবন প্রবাহকে ভিত্তি করেই সৃষ্ট এ উপন্যাস। নদীকে বাদ দিয়ে চলে না জীবন, জীবনের সংস্কৃতি। নদীর মতো ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় মানুষের জীবন। নদী যেন মানব জীবনের প্রতীক। 'আমাদের জীবন নদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িতই নয় শুধু ...নদীর মধ্যেই আমাদের জীবনের উৎস।'[১০] পৃথিবীর অন্যান্য নদীর মতো কর্ণফুলীও তার দুই তীরের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখে মিশে আছে গভীরভাবে। সম্ভবত এই বিবেচনাবোধ থেকেই একজন লেখক বলেছেন, "'কর্ণফুলী' পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।"[১১]

'কর্ণফুলী' উপন্যাসের ভৌগোলিক এলাকা চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ির কাসালং নামক স্থান। চট্টগ্রামের সমতল ভূমি অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা ফুলছড়ি অনেক দূরের পথ। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে লেখা আছে, 'চাটগাঁ থেকে চন্দ্রঘোনা হয়ে রাঙামাটি পঁয়ষট্টি মাইল, এবং তার পরেও চৌদ্দ। দূর কম নয়।'[১২] সমতল অঞ্চলের দরিদ্র চাটগাঁবাসীর অনেকেই পার্বত্য অঞ্চলে যাওয়া-আসা করে ছোট-খাট ব্যবসার জন্যে। উপন্যাসের রমযানও ব্যবসার কারণে যায় চন্দ্রঘোনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সে সংগ্রহ করে বাঁশ। সংগ্রহ করা বাঁশ সে সরবরাহ করে চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে। এ সুবাদে রমযান পার্বত্য অঞ্চলের ফুলছড়িতে জমি কেনে এবং ঘর তৈরি করে অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে। উপন্যাসে চট্টগ্রামের সমতল এলাকার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগের মূলে রমযান। পার্বত্য এলাকায় রমযানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটে লালচাচা বা পাগলা জামাইয়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে রমযানের সঙ্গী ইসমাইলেরও পরিচয় ঘটে। লালচাচা বা পাগলা জামাইয়ের আদি বাস ছিল চট্টগ্রাম। চাকমা মেয়ে ধলাবিকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সে থেকে যায় এ অঞ্চলে।

রমযান ও ইসমাইলের সঙ্গে লালচাচার সম্পর্ক এবং তাদের এ অঞ্চলে অবস্থানের মাধ্যমে উপন্যাসে এসেছে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার নানা চিত্র। উপন্যাসে ধৃত চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চল, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই তথা পার্বত্য অঞ্চলের ফুলছড়ি পর্যন্ত বৃহত্তর এলাকা কর্ণফুলী নদী বিধৌত এলাকা।

উপন্যাসটির কাহিনী শুরু হয়েছে চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চল থেকে। কামারের কামারশালায় রমযান ও ইসমাইলের দেখা হয়। এখানে দুজনেই হাতিয়ার মেরামত করতে দিয়েছে। রমযান ইসমাইলের চেয়ে বয়সে বড়। তারা একই এলাকার বাসিন্দা, দুজন দুজনকে আগে থেকেই চেনে। রমযানের রয়েছে ঠিকাদারি ব্যবসা। সে নানা উপায়ে বেশ অর্থ-সম্পদ অর্জন করেছে। তা তার চলা-ফেরা, বেশ-ভুষায় বোঝা যায়। ইসমাইল উঠতি যুবক, দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন সন্তান। জীবনের শুরুতেই অভাবে পড়ায় বখাটে হয়ে যায় সে। পকেটমারদের সঙ্গে মিশে সেও হয়ে ওঠে পাকা পকেটমার। এ সব দরিদ্র সন্তানদের সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন, 'দারিদ্র্যের কারণেই এরা সবাই দুষ্কর্ম করে, সমাজের ঘৃণিত পথে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে।'[১১] ইসমাইল পকেটমার হলেও তার মনে আছে অন্য এক স্বপ্ন। সে হতে চায় সারেং। সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সারেং হওয়ার সাহস ইসমাইলের থাকলেও, তার সামর্থ নেই সারেং হওয়ার খরচ যোগানোর। মনের লালিত স্বপ্ন আর বাস্তবতার ব্যবধানে ইসমাইল হতাশ হয়ে যায়। কামারশালা থেকে রমযানের সঙ্গী হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফিরছিল ইসমাইল। অনেকটা ক্লান্ত সে যেন, তন্দ্রামগ্ন হয়ে ভাবছে তার কাজ ও উপার্জনের বিষয়ে। প্রতিদিন পাঁচ সাতটি পকেট মারতে পারলেও তা থেকে পাওয়া টাকায় চলে না তার। মানুষের পকেটেই থাকে না টাকা, সবাই যেন ভুগছে অর্থকষ্টে। এ প্রসঙ্গে ইসমাইলের মনে পড়ে পকেটমার সর্দার রূপার দেয়া প্রস্তাবের কথা। তিন কুড়ি বা ষাট টাকা বেতনে তার পকেটমারার ছোট দলটি চালানোর কথা বলেছিল। তা ছিল মোটামুটি ভালো প্রস্তাব। কিন্তু স্বাধীন মনোভাবের ইসমাইল তা গ্রহণ করে নি। তা ছাড়া সারেং হওয়ার স্বপ্নও তাকে ভিড়তে দেয় নি কোন নির্দিষ্ট চাকরিতে। সব গ্লানি মাথায় নিয়ে প্রতিনিয়ত সে চেষ্টা করত সারেং হওয়ার 'নলি' বা সনদপত্র সংগ্রহের। ঘোড়ার গাড়িতে সে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এতই ভেঙে পড়ছিল যে, হাতের মুঠোয় ধরা ড্যাগার চেপে ধরে নিজের অজান্তেই। তার হাত কেটে রক্ত বের হচ্ছিল। ইসমাইলের মানসিক এ অশান্তি সম্পর্কে ধারণা করতে পারছিল রমযান। সে সুযোগ বুঝে ইসমাইলকে ভেড়ায় তার দলে। রমযানের প্রয়োজন ছিল এমন একজন সঙ্গী। পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবসা করতে ইসমাইলের মতন লোকই খুঁজছিলো সে। ঠিকাদারি ব্যবসায় লোক ছাড়া চলে না, অন্যদিকে ইসমাইলেরও প্রচণ্ড অভাব ছিল একটি কাজের। ফলে রমযানের প্রস্তাব পেয়ে তা গ্রহণ করে ইসমাইল। সে একইসঙ্গে ভাবছিল, আয়-রোজগার ভালো হলে 'নলি' বা সনদপত্রের জন্যে টাকা জমানো যাবে। রমযান শুধু চন্দ্রঘোনার কাগজের কলের বাঁশ সরবরাহকারীই নয়, সে

যুদ্ধের সময় করত নারী পাচার। নারী পাচার করে রমযান তখন আয় করেছিল অনেক টাকা। কিন্তু সে টাকা সে যত্ন করে রাখতে পারে নি। এ জন্যে তার মনেও ছিল কষ্ট। গরুর গাড়িতে চলতে চলতে রমজানও ভাবছিল তার অতীত নিয়ে। রমযানের গন্তব্য অনুসারে গাড়ি থামালে ইসমাইল বলে, 'কিছু টেঁয়া দও। বাড়িৎ দেওন পড়িব।'[১৪] দশ টাকা নিয়ে ইসমাইল আগামীকাল কালুরঘাট যাওয়ার পাকা কথা বলে বাড়ির পথ ধরে। রমযান তার অতীতের অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। মদ খাওয়া ও বেশ্যালয়ে যাওয়া ছিল তার নেশা। সেখানে ছিল তার নির্দিষ্ট পতিতা, নারগিস নামের পতিতার ঘরেই ছিল রমযানের বিচরণ। নানী বলে পরিচিত বয়স্ক মহিলার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সে পতিতালয়টি ছিল চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চলে।

পাহাড়তলী চট্টগ্রামের শ্রমিক অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। দরিদ্র শ্রমিক-মজুরদের আবাসস্থল। সেখানকার একটি দরিদ্র শ্রমিক পল্লীতে বেড়ে ওঠে ইসমাইল। এখানে বসবাসকারীরা প্রায়ই কল-কারখানায় কাজ করে। কেরামত সেখানকারই বাসিন্দা। সে-ও কলকারখানায় জেটিতে কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। ইসমাইল তার আত্মীয়। কেরামতের মেয়ে জুলি ইসমাইলের মাকে ফুফু বলে ডাকে। সে দিক থেকে কেরামত ইসমাইলের মামা। কেরামত দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে শ্রমিকের কাজ করায় শরীর তার ভেঙে পড়েছে, হয়েছে বাতে আক্রান্ত । তবু সংসার চালানোর জন্যে তাকে যেতে হয় কাজে। কাজ শেষে বাড়ি ফেরে ক্লান্ত হয়ে। তখন জুলির সেবাই তার শরীর ভালো হওয়ার ঔষধ। সে দিন জুলি তার বাবার শরীর পা দিয়ে দাবাতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ে অন্য কারণে। সবে মাত্র যৌবনে পা দেয়া জুলির মনে টান জমেছে ইসমাইলের জন্যে। সে দৌড়ে যায় তার মানুফুপুর ঘরে। সেখানে ছিল ইসমাইল, জুলি তার ফপু মানুর প্রতিও বেশ আন্তরিক, সে তার মানু ফুপুর নিত্য অভাবের সংসারের জন্যে লাকড়ি যোগাড় করা থেকে শুরু করে সব রকমের সহায়তা করত। জুলি যেন মানুর মেয়ের মতো। ফলে মানুর ফুপুর মনেও ইচ্ছা জাগে জুলিকে ইসমাইলের বউ করে ঘরে আনার। জুলি তা বুঝতে পারে ; ফলে তার মনেও এক ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। জুলি ইসমাইলের সামনে যাওয়ার আগে ভাবে তার রূপ নিয়ে, যা এতদিন সে কল্পনায়ও আনে নি। সে তার রূপের তুলনা করে বান্ধবী ফখরির সঙ্গে। ফখরি বিয়েতে পেয়েছে স্বর্ণালঙ্কার ও পোশাকসহ নানা প্রসাধনী দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী। বান্ধবীর সুখের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করতে গিয়ে জুলির ভাবনায় আসছিল ইসমাইল। কিছুদিন আগে সে জুলির হাতে পরিয়ে দিয়েছিল একটি সোনার আংটি। তাকে নিয়ে তাই জুলির এত উচ্ছ্বাস। কিন্তু হঠাৎ জুলির উচ্ছ্বাসে-আগ্রহে ভাটা পড়ে ইসমাইলের কাছে ড্যাগার দেখতে পেয়ে। তখন দুশ্চিন্তায় পড়ে জুলি এবং তার ফুপু মানু। ইসমাইলকে বিয়ে দিয়ে সাংসারিক করার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছিল তার মা মানু। কিন্তু সে তাতে মন দেয় নি ; বরং সে ভেবেছিল, বিয়ে করে সংসারী হলে সে কখনও সারেং হতে পারবে না। জুলিকে বিয়ে করতে

ইসমাইলের অনাগ্রহে জুলি অপমান বোধ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল উপহারের আংটি এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> ...মুখে ফুটতে পারতো গোপন হাসির আভাস। কিন্তু সব বৃথা, আশা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র, একটু রঙের কথা বলা, মনের কথা নয়। আর সোনার আংটি? একদম ভাঁওতা। দোকান থেকে চুরি করা জিনিশ, বিক্রি করতে না পেরে গছিয়েছে।[১৫]

ইসমাইল পরের দিন যোগ দেয় রমযানের সঙ্গে। রমযানের রয়েছে ঠিকাদারী ব্যবসা, সে ব্যবসার প্রয়োজনেই লোকজন নিয়ে তার পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ির পথে যাত্রা। ইসমাইল সে দলেরই একজন। তারা নদী পথেই রওয়ানা দেয়, আগের তুলনায় নদীপথে ডাকাতের ভয় তুলনামূলক ভাবে কম। দীর্ঘ ঊনআশি মাইল পাড়ি দিয়ে পৌঁছে তারা ফুলছড়িতে। এই অঞ্চলে রমযানের সঙ্গে সম্পর্ক লালচাচা বা পাগলা জামাইয়ের। তার বাড়ি চট্টগ্রাম। চাকমা মেয়ে ধলাবিকে বিয়ে করে সে পার্বত্যাঞ্চলে স্থায়ী হয়েছে। মদ, তাড়ি পান করতে অভ্যস্ত সে। রমযান এখানে এলে তার মদ, তাড়ির একটা ব্যবস্থা হয়। ধূর্ত রমযান তাকে মদ তাড়ি দেয় অন্য কারণে। সে লালায়িত লালচাচার সুন্দরী মেয়ে রাঙামিল্যার জন্যে। পাগলা জামাই বা লালচাচার সঙ্গে ইসমাইলেরও ঘটে পরিচয় এবং ইসমাইল অল্পতেই রমযানের দুর্বুদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। রমযানের গোপন বিষয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে কৌশল করে সে। কাজে না গিয়ে ইসমাইল ফুলছড়ির পথ-ঘাট ঘুরে দেখে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ সে। নদীর ঘাটে ঘাটে মানুষেরা নিত্য দিনের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তার চেয়েও ভালো লাগে তার পাহাড়ী মেয়ে রাঙামিল্যাকে। রোজই সে ঝরণায় আসতো খাবার পানি সংগ্রহের জন্যে। প্রতিদিন তাকে না দেখলে ইসমাইলের দিন কাটে না। তাকে দেখার জন্যেই ঝরণার ধারে বসে থাকে ইসমাইল। কিন্তু রাঙামিল্যার রয়েছে নীলমণির সঙ্গে প্রেম। সে বিষয়ে তার মা-বাবাও অবগত। কিন্তু ধলাবি ও লালচাচা নীলমণির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ, নীলমণিরা দেওয়ান বংশের সম্পদশালী মানুষ। কেনারাম দেওয়ান তার ছেলের এ প্রেমের মূল্য হয়ত দেবে না। তাই ধলাবি ও লালচাচা চিন্তিত মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অন্য দিকে নীলমণি তার নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। সে তার বাবা কেনারাম দেওয়ানের কাছে ব্যবসা করার জন্যে টাকা চেয়েছিল । টাকা না পেয়ে বাড়ি ছেড়ে লুকিয়েছিল কিছুদিন অন্য স্থানে। ছেলেকে খুঁজতে একদিন কেনারাম দেওয়ান এসেছিল লালচাচার বাড়িতে। তখন ধলাবি ও লালচাচা রাঙামিল্যাকে দিয়ে মেহমানকে পান দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যাতে করে সে তার মেয়েকে দেখে যায়। তাদের ধারণা, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন-মলিন থাকলেও তাতে শারীরিক সৌন্দর্য তো মলিন হয় নি। ফলে মেয়েটিকে কেনারাম দেওয়ানের চোখে অবশ্যই ভালো লাগার কথা। লালচাচা ও ধলাবি যখন মেয়ের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে ছিল গভীর উদ্বিগ্ন ; তখনই ফিরে আসে নীলমণি। সে রাঙামিল্যার জন্যে নিয়ে আসে কাঁচের চুড়ি। এতে রাঙামিল্যার মা-বাবার মনের দুশ্চিন্তা অনেকটা কমে। কিন্তু তারা ভরসা পায় না, রাঙামিল্যা দেওয়ান বাড়ির বউ হতে পারবে বলে।

বিয়েরযোগ্য মেয়েকে নিয়ে তাদের ছিল না ভাবনার অন্ত। তাদের একান্ত ইচ্ছা, যেন নীলমণির সঙ্গেই বিয়ে হয় রাঙামিল্যার। এ সময় ইসমাইলের উপস্থিতিতে তারা হয় বিচলিত। ইসমাইল রাঙামিল্যাকে ভালোবেসে উপহার দেয় শাড়ি। একদিকে রাঙামিল্যার প্রতি নীলমণি ও ইসমাইলের প্রেমের টান, অন্যদিকে তার প্রতি রমযানের কুদৃষ্টি। তাতে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয় লালচাচা ও তার স্ত্রী। যৌনতাড়িত হয়েই রমযান লালচাচাকে দেয় অর্থ, মদ-তাড়ি। কিন্তু রমযানের আসল মনোভাবের প্রমাণ পেয়ে লালচাচা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত। সে গলা টিপে রমযানকে হত্যা করার কথা ভাবে। রমযানের মনের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে ইসমাইল জানলেও তা সে প্রকাশ করে না কখনও। রমযানও ইসমাইলের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব করে না। ইসমাইল রমযানের সঙ্গে বনে বাঁশ কাটতে যেতে না চাইলেও সে তা মেনে নেয়। ঘর পাহারা দেওয়ার অজুহাতে ঘরে থাকে ইসমাইল। তার আসল উদ্দেশ্য ঘর পাহারা দেওয়া নয় বরং রাঙামিল্যাকে দেখা। সে কলসি ভরে পানি নেওয়ার জন্যে ঝরণায় আসলে ইসমাইল তখন সেখানে যায় এবং তার ভালোবাসার কথা জানিয়ে রাঙামিল্যাকে উপহার দেয় জুলির ফিরিয়ে দেওয়া সেই সোনার আংটিটি। রাঙামিল্যা সে উপহার গ্রহণে অসম্মত হলে, ইসমাইল আংটিটি ভরা কলসিতে ডুবিয়ে দেয়। ইসমাইলের গভীর অনুরাগে রাঙামিল্যা মুগ্ধ হলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। নীলমণিই রাঙামিল্যার আসল প্রেমিক। ইসমাইল শত চেষ্টা করেও মন পায় না তার। সে হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে। পরে মনে প্রশান্তি পাওয়ার জন্যে সে নৌকা ভাড়া করে ঘুরতে যায় নদীতে। নৌকার মাঝির সঙ্গে তার অনেক কথা হয়, মাঝিও তার জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে ইসমাইলের সঙ্গে। বাঁশ কেটে নদী পথেই রমযান ফিরে আসে, ফলে পথে তাদের দেখা হয় এবং একত্রে ফেরে তারা ফুলছড়ির আস্তানায়।

পার্বত্য অঞ্চলের ফুলছড়ির ধলাবি ও পাগলাচাচার মতো সমতল অঞ্চলের পাহাড়তলীর কেরামতও বিয়েযোগ্য মেয়ে নিয়ে চিন্তিত। দিনমজুর কেরামত, তার সংসারে রয়েছে অভাব। অর্থাভাবে মেয়েকে ভালো পাত্রস্থ করা তার পক্ষে কঠিন। ফলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত কেরামত ও তার স্ত্রী। তারা ঘটকের মাধ্যমে মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র খোঁজে। ঘটক গণু মুন্সির সাহায্যে জুলির বিয়ে প্রায় পাকা করে ফেলে কেরামত। পাত্র মুকিম মোল্লা। পাঁচজন সন্তান রেখে কিছুদিন আগে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ব্যবসায়ী মুকিম মোল্লা অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক। ঘটক গণু মুন্সি মেয়ে দেখানোর খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দেয় কেরামতকে। কেরামত পাত্র পক্ষের টাকা রাখতে চায় নি, কিন্তু দরিদ্রতার কারণেই সে নিয়ে নেয় টাকাটি। গণু মুন্সি কৌশলে অধিক বয়সী এই পাত্রের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী করায় কেরামত ও তার স্ত্রীকে। কিন্তু মেয়ে জুলি এ বিয়েতে অসম্মত। সে এ বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আশ্রয় নেয় তার ফুপু মানুর। মানুও বিচলিত হয়ে ওঠে এ ঘটনায়। সে ভাবে এ পরিস্থিতিতে ইসমাইলকে খবর দেওয়া উচিত। পড়শী মক্কী সাহেবের ছেলের মাধ্যমে

লেখানো চিঠি, অবশেষে আবুর কাছে পাঠানো হয়েছিল ফুলছড়ির কাসালং। মানুর মনে মনে ইচ্ছা, জুলিকে ইসমাইলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলের বউ করার। আর জুলিও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি ইসমাইলকে। তাই জুলি ও তার ফুপু মানু দু জনেই ইসমাইলের ফেরার অপেক্ষায় ছিল আসন্ন বিপদ এড়ানোর জন্যে। কিন্তু ইসমাইল তখন ফুলছড়ির রাঙামিল্যাকে পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

রাঙামিল্যা রাতের গভীরে নীলমণির হাত ধরে যায় পালিয়ে। ইসমাইলও তাদের পিছনে ছোটে রাঙামিল্যাকে পাওয়ার প্রবল বাসনায়। এদের পিছনে রমযানের পোষা গুণ্ডা ইতু, হাপুও ছুটছিলো প্রতিশোধ নিতে। রমযানের পোষা গুণ্ডাদের ইসমাইল সহজেই পরাজিত করে। ফলে রমযানের প্রতিশোধ নেওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। নীলমণি এসেছিল কাপ্তাইয়ে কাজের ব্যবস্থা করে, সেখানে পৌঁছে রাঙামিল্যাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে। ইসমাইলও চায় রাঙামিল্যাকে ধরে রাখতে। ইতু ও হাপু গুণ্ডাকে কর্ণফুলীর পানিতে ফেলে দেওয়ার পর নীলমণিকে পরাভূত করা ইসমাইলের কাছে ছিল অনেক সহজ। সে সহজেই পারতো রাঙামিল্যাকে অধিকার করে নিতে। কিন্তু চন্দ্রালোকিত সে রাতে কেমন করে যেন বদলে যায় ইসমাইলের মন। বদলে যায় রাঙামিল্যাকে পাওয়ার তীব্র বাসনা। বরং নীলমণি ও রাঙামিল্যাকে নিরাপদে কাপ্তাই পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সে তাদের সঙ্গে পথ চলতে থাকে। ইসমাইল তার পরিবর্তিত মন নিয়ে ফিরে আসে চট্টগ্রামে পটিয়া মুন্সির কাছে। তার মাধ্যমে সে সংগ্রহ করবে সারেং হওয়ার 'নলি' বা সনদ। মুন্সির কাছ থেকে 'নলি' বা সনদ নিয়ে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারেং হিসেবে। মুন্সি তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে অফিসিয়াল সাহায্য পেয়েই সকলকে অপেক্ষকৃত কমমূল্যে 'নলি' বা সনদ সরবরাহ করে আসছিল। সে বাজারে এক ঘিঞ্জি হোটেলের পাশে টুল পেতে বসত, সেখানেই আসতো 'নলি' প্রত্যাশী সকলে। ইসমাইল নিজের 'নলি' প্রসঙ্গে মুন্সির সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফিরে আসে।

মানুর উদ্বেগ অনেকটা কমে যায় ইসমাইল বাড়িতে আসায়, কিন্তু জুলির অভিমান হয়। সে ভাবছিল, ইসমাইলের অবহেলার কারণেই পাঁচ সন্তানের পিতার সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন চলছে। বিয়েতে জুলির মত ছিল না ; কিন্তু সে তার বাবা-মায়ের সুখের কাথা ভেবেই বিয়েতে সে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ইসমাইল জুলিকে সামনে পেয়ে জোর করে তাকে বাধ্য করছিল দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে। এতে জুলির ফুপু মানু সামাজিকতার কথা ভেবে অস্থির হলেও, মনে মনে খুশিই হয়েছিল। কেননা এই ঘটনা জানাজানি হলে জুলির বিয়ে নিশ্চিত ভাঙবে। কারণ, নষ্ট মেয়েকে জেনে শুনে কেউ বউ করে ঘরে তুলবে না। তখন জুলিই হবে ইসমাইলের স্ত্রী। অবশেষে তা-ই হলো। জুলিকে ইসমাইল বিয়ে করেছিল এবং গণু মুন্সির ঠিক করা পাত্রের খরচ হওয়া সমুদয় অর্থও ফিরিয়ে দিয়েছিল ইসমাইল।

এক পর্যায়ে ইসমাইল ও জুলির দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় অর্থ কষ্ট। জুলি সন্তানসম্ভবা হলে তাকে ভালো খাবারও কিনে দিতে পারতো না ইসমাইল। অর্থ

উপার্জনের কোন পথ না পেয়ে অবশেষে সে কুলির কাজ নেয়। তার এমন দুর্দিনের সে সংবাদ পেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির সারেং নেওয়ার কথা। পটিয়ার মুন্সিই ছিল তার ভরসা। সে সময় 'নলি' পাওয়া সারেং এর সংখ্যা ছিল দু শ। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও মুন্সি ইসমাইলকে পাঁচশ টাকার বিনিময়ে সারেং-এর কাজ ঠিক করে দেবে বলেছিল কিন্তু তার কাছে এত টাকা ছিল না । টাকা সংগ্রহের জন্যে সে রূপার সঙ্গে নৌকা লুট করতেও রাজি হয়েছিল। মাল ভরা একটি নৌকা লুট করতে পারলেই পাওয়া যেত কাঙ্ক্ষিত টাকা। কিন্তু এতেও ব্যর্থ হয় ইসমাইল। সে তার আর্থিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অফিসের পিওন পদের একটি কাজ ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু সে কাজটিও তার হয় নি দু জন গণ্যমান্য ব্যক্তির সুপারিশের অভাবে। এর পর ইসমাইল ভেবেছিল কর্ণফুলী বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ পাওয়ার কথা। কোন না কোন ভাবে তাকে জোটাতেই হবে একটি কাজ, নইলে তার স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকা হবে দায়। ইসমাইলের এই দুঃসময়ে তার স্ত্রী জুলি হয়েছিল সহায়। সে তার সামান্য অলঙ্কার বিক্রি করতে বলেছিল, অলঙ্কার বিক্রির টাকা দিয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছিল ইসমাইলকে। অবশেষে ইসমাইলের দুঃসময় কেটেছিল এক ব্যবসায়ীর কাছে সারেং এর চাকরি পেয়ে। কিন্তু ইসমাইলের মা ও স্ত্রী চাইত না ইসমাইল সারেং হয়ে দূর দেশে যাক। সে জন্যে তারা তাবিজ করেছিল কানু ফকিরের মাধ্যমে। কিন্তু কানু ফকিরের তাবিজ কোন কাজে আসে নি। এক দিন ঠিকই ইসমাইল সারেং রূপে জাহাজে চড়ে যাত্রা করে দূর সমুদ্রের পথে। উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে আছে :

> শেষ সিটি বেজে উঠতেই নিমিষে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জাহাজের দৈত্যাকার যন্ত্রগুলো আগেই চালু হয়েছিল, এবার প্রচণ্ড ধুপ্ ধুপ্ শব্দ করতে থাকে। নদীর বুকে তোলপাড়, চলতে শুরু করেছে। সারেংরা রেলিঙে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, আর কেউ কেউ দেখাচ্ছে লাল নীল রুমাল। জেটির ওপারে পরিবার-পরিজন।[১৬]

অন্যান্য সবার মতো অশ্রুসিক্ত নয়নে ইসমাইলকে তার স্ত্রী জুলি ও তার মা বিদায় জানায়। এ ভাবে সমাপ্তি ঘটে উপন্যাসের কাহিনীর ।

কর্ণফুলী উপন্যাসে উপস্থাপিত মানুষের পেশায় বিচিত্রতার তুলনায় জীবন বাস্তবতা অনেক বেশি। প্রতিদিন তাদের বাঁচতে হয় সংগ্রাম করে। জীবন সংগ্রামের এমন বাস্তব চিত্র উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় কামারশালার মাধ্যমে। কামারশালার চিত্রটি নিম্নরূপ :

> অন্ধকার গলি, সুড়ঙ্গের মতো, তার ভিতরে বাঁশের বেড়ার ছোটো কামারশালা বাঁ হাতে শিকল ধরে টানা হাপরের গনগনে আগুন মিস্ত্রির পেশীবহুল কালো দেহটাকে মোটা রেখায় উৎকীর্ণ করেছে এবং সে রক্তিম আভায় রঙিন হয়ে থাকা তার নাক-মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে ঘাম।
>
> খানিকক্ষণ ঘন ঘন টানবার পর লাল টকটকে একটি লোহার খণ্ড তুলে সাঁড়াশীটা সামনের ছেলেটিকে ধরতে দিল।
>
> ও সেটাকে ইস্পাতের গাদার ওপরে চেপে ধরলে কামার বিরাট ওজনের হাতুড়িটা তুলে তা'তে পেটাতে থাকে। একেকটা আঘাত, প্রচণ্ড বিচ্ছুরণ। তার পেশী থেকে

> যেন ঠিকরে পড়ে আদিম জান্তব শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে মাটি. কাঁপে আধভাঙা বেড়া. টিনের চাল।[১৭]

কামারের তৈরি হাতিয়ার ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন অচলপ্রায়। কাঁচি, কুড়াল. কোদাল ইত্যাদি হাতিয়ার প্রতিদিনই আমাদের কাজে লাগে। ফলে এসব হাতিয়ার-ভিত্তিক পেশাগুলো আমাদের সমাজ জীবনে হয়ে উঠেছে অনিবার্য।

আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন মধ্যবয়সী গাট্টাগোট্টা রমযান এসেছিল কামারশালায়। তার জীবনে রয়েছে বাস্তবতার নানা অভিজ্ঞতা। সে সুচতুর জীবনযোদ্ধা। কামারশালায় তৈরি করতে দেওয়া হাতিয়ার নিতে এসে তার দেখা হয় ইসমাইলের সঙ্গে, সবেমাত্র যৌবনে পা দেওয়া টকবগে তরুণ সে। বেপরোয়া স্বভাবের ইসমাইল স্বাপ্নিক। পিতৃহীন অভাবের সংসারে তার বড় হওয়া। তার স্বপ্ন ও বাস্তবতায় রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। অভাবের কারণেই সে মেশে বখাটেদের সঙ্গে এবং হয়ে ওঠে বখাটে, পকেটমার। পকেটমার হিসেবেই সে শুরু করে তার রোজগার। সমাজস্বীকৃত না হলেও অপরাধমূলক এ পেশা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রহণ করে এক শ্রেণীর লোক। ইসমাইলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে অন্যান্য পকেটমারদের। কামারের ঘরে বসেই ইসমাইল রমযানের পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাতিয়ে নেয় মানিব্যাগ। তা অবশ্য রমযানের চোখ এড়ায় না। এসব বিষয়ে রমযান আরও অভিজ্ঞ। সে ভাতিজা সম্পর্কিত ইসমাইলকে উদ্দেশ্য করে বলে :

> বহুৎ রুই-কাতলা চরাই, আঁর উপর টেক্কা মারে ভাইপুৎ? দে মানিব্যাগগুয়া ফেরৎ দে।[১৮]

ইসমাইলও কামারশালায় এসেছিল তার হাতিয়ার বা ড্যাগার 'সান' বা ধার দেওয়ার জন্যে। চতুর রমযান ইসমাইলের ইচ্ছানুসারে ড্যাগার 'শান' দেওয়ার 'আটআনা' পয়সা কামারদের পরিশোধ করে। রমযান স্বার্থ ছাড়া ইসমাইলের জন্যে 'আটআনা' পয়সা খরচ করে নি। সে গোপন মতলব মাথায় নিয়ে ইসমাইলকে সঙ্গে করে চড়ে বসে ঘোড়ার গাড়িতে। বলা বাহুল্য. বাহন হিসেবে ঘোড়ার গাড়ি আমাদের দেশে এখন খুব একটা দেখা না গেলেও এক সময় ঘোড়ার গাড়িই ছিল প্রধান এবং অভিজাত লোকদের বাহন। ঘোড়ার গাড়ি চালিয়েই অনেকে চালাতো তাদের সংসার। এ কালে উন্নত যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি গেছে হারিয়ে। তবে কোথাও কোথাও এখনও এর প্রচলন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> একটা খালি ঘোড়াগাড়ি যেতে দেখে রমযান হাত উঁচিয়ে তাকে ডাক দেয়। গাড়িটা থামতেই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পড়ল ওরা। একটা এলাকার নাম করল. এরপর আবার আদেশের সুরে বলল, জলদি!
>
> সঙ্গে সঙ্গে হিস্‌হিস্‌ চাবুকের শব্দ। লাগামে বাঁধা দু'টি ঘোড়ার মুখ ঘন ঘন ওঠা নামা করে। একটানা. অবিরাম খুরের আওয়াজ।[১৯]

ঘোড়ার গাড়িতে গভীর ভাবনামগ্ন ইসমাইল। সে তার আর্থিক সংকট নিয়ে ভাবে। সুকৌশলে সে প্রতিদিন পাঁচ সাতটি পকেট কাটে। এতে পাওয়া টাকায় তার চলে না।

যেন জনগণের পকেট ফাঁকা। তার ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয় পকেটমারের সর্দার রূপার কথা ; তার রয়েছে নিজস্ব পকেটমারের দল। রূপার ছোট দলটি চালানোর জন্যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে। মাসিক বেতন ষাট টাকা। ইসমাইল তা গ্রহণ করে নি তার স্বাধীন মানসিকতার জন্যে। কিন্তু অভাবে পড়ে সে কথাটিই ভাবছিল ইসমাইল। রূপার প্রস্তাব প্রসঙ্গে ইসমাইল ভাবে :

> রুপা একটা প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। কাজ বেশি নয়, বাচ্চাদের দলটাকে চালনা করা। মাইনে তিন কুড়ি টাকা। দুই টাকা রোজ, মন্দ নয়।[২০]

রুপার দেওয়া প্রস্তাব আর্থিক দিক থেকে ভালো হলেও ইসমাইল তা গ্রহণ করতে পারে নি তার স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং সারেং হওয়ার উচ্চাশার জন্যে। সে প্রতিনিয়ত ভাবত কি করে 'নলি' বা সারেং হওয়ার সনদ পাওয়া যায়। রূঢ় বাস্তবতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে বিচলিত ইসমাইল। হাতের মুঠোয় ধরা ড্যাগারে নিজের অজান্তেই চাপ পড়ায় তার হাত কেটে যায়। এভাবে জীবনের জ্বালা প্রকাশ করায় একজন সমালোচক লেখকের প্রশংসা করে বলেছেন :

> জীবনের ঘনিষ্ঠ চিত্র তাঁর মতো আঁকতে পেরেছেন খুব কম লেখকই।[২১]

ইসমাইলের জটিল সমস্যা বুঝে রমযান তাকে তার কাজে নিযুক্ত করে, গোমস্তা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি যাওয়ার জন্যে। রমযানের প্রয়োজন ছিল ইসমাইলের মতো একজন সাহসী সঙ্গী। পার্বত্য অঞ্চলে কাজ ও ঠিকাদারী ব্যবসা করতে সাহসী মানুষই দরকার। রমযান পার্বত্য এলাকায় ঠিকাদারী ব্যবসা করে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে তা সরবরাহ করত চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে। কাগজ তৈরির জন্যে 'কর্ণফুলী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নানা জাতের বাঁশ।'[২২] বন বিভাগের বিনা অনুমতিতে গোপনে বাঁশ কাটাতে রমযান অসংখ্য দিনমজুর খাটায়। শুধু বাঁশ সরবরাহের ব্যবসাই নয়, রমযানের ছিল নারী পাচারের ব্যবসাও। যুদ্ধের সময় সীমান্তের ক্যাম্পে মুরগি, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সে সরবরাহ করত ; এ সবের সঙ্গে সে পাচার করত নারী। এ থেকে সে উপার্জন করেছিল অনেক অর্থ। সে অর্থ যত্ন করে রক্ষা করতে না পারায় তার মনে আপসোস জন্মেছিল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> রমযানেরও আপসোস কম নয়। গাদাগাদা কড়কড়ে টাকা কি আর কখানো মেলে? কষ্ট লাগত। বাড়ি পাকা করেছে এ আর কি? আরেকটা শাদীও করেছে। কিন্তু বিশেষ কিছু হলো না একথা ঠিক। কাগজের নোট সব ছেঁড়া কাগজের মতোই উড়ে গেল। তবু রক্ষে গোপন ঠিকাদারিটা ছিল; বছরে দুটো যোগাড় করে দিতে পারলেও হাজার তিনেক টাকা নেট আয়। উপভোগ তো উপরি পাওনা।[২৩]

কামারশালা থেকে ফেরার পথে চলমান ঘোড়ার গাড়িতে বসেই রমযান ও ইসমাইল ভাবছিল নিজেকে নিয়ে। একদিকে বর্তমান ব্যবসার পরিকল্পনা করে, অন্যদিকে অতীতের সমৃদ্ধ ব্যবসার কথা ভেবেও অস্থির হয়। আর ইসমাইল ভাবে তার ভবিষ্যত নিয়ে। সে স্বপ্ন দেখে সারেং হওয়ার, তাই সে আশাহত হয় না। বরং অধিক উপার্জন করে 'নলি' বা সারেং হওয়ার সনদপত্র সংগ্রহের সংকল্পে সে রমযানের সঙ্গে যায় ফুলছড়ি। একজন সমালোচক রমযান ও ইসমাইল সম্পর্কে বলেছেন :

> কর্ণফুলী উপন্যাসে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রমযান এবং নিম্নবিত্ত ইসমাইলের মধ্যবিত্ত-সুলভ উচ্চাভিলাষ ও সুদূরের প্রতি কঠিন-সুলভ তীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যে-কোন প্রকারে অর্থ-উপার্জনে লিপ্ত থাকায় রমযান এ দেশের উদীয়মান মধ্যবিত্তের সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।[২৪]

সাহসী, স্বাপ্নিক-নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ইসমাইলের বসবাস পুহাড়তলীর 'ঘিঞ্জি খড়োঘরের হিজিবিজি'-তে মা মানুবিবির সঙ্গে। এ বস্তিতে বাস করে বিভিন্ন মিল-কলকারখানার শ্রমিক-মজুরেরা। দারিদ্র্যে ভরা তাদের জীবন। তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার ছবি ভেসে থাকে তাদের অনাহারী মুখ, আর ভাঙাচোরা ঘরগুলোয়। উপন্যাসে তাদের বাসগৃহ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> রাস্তা থেকে কিছু দূরেই মুটে মজুরের বস্তি গাদাগাদি ঠাসাঠাসি, ঘিঞ্জি খড়োঘরের হিজিবিজি। লোকগুলি কঠিন, কালো, সূর্যের আলোকে দেখলে মনে হয় কাক কুকুর মানুষে প্রভেদ খুব বেশি নয়, তফাৎটা শুধু আকৃতির।[২৫]

পাহাড়তলীর এই বস্তিতে আরও থাকে কেরামত নামের একজন শ্রমিক। সে দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে শ্রমিক-মজুরের কাজ করে আসছে। ক্রমাগত কাজের কারণে এ সব মুটে-মজুরের জীবন হয়ে যায় অবসাদগ্রস্ত। অবসাদগ্রস্ত কেরামতও। সে মানুবিবির ভাই। সে-ই তার প্রতিবেশী আত্মীয়। কেরামত কাজ শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরে, স্ত্রী ও সন্তানের কাছে। অনেক শ্রমিক-মজুর যারা কাজ শেষে বাসায় ফেরে না। তারা বন্দরের জেটিতে, কারখানার কোথাও মাতাল হয়ে পড়ে থেকে রাত পার করে। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কর্ণফুলী (১৯৬২)-তে তিনি সাধারণ কাহিনীকে অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[২৬]

ইসমাইল পরিবর্তন করতে চায় তার নিম্নবিত্তের জীবন ও পরিবেশ। গোপন আশা এই নিয়েই পর দিন সে কালুরঘাট যায় রমযানের সঙ্গে যোগ দিতে। তারা নদী পথে পৌঁছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি। কাহিনীর এ পর্যায়ে জানা যায়, পার্বত্যাঞ্চলের মানুষের সমাজ ও জীবনের বিবরণ।

ফুলছড়ি যেতে নদী পথের দু ধারে তাদের চোখে পড়েছিল আধুনিক জীবনের নানা উপকরণ। ইসমাইলের মনোজগতে ঘটায় কিছুটা পরিবর্তন। এ সম্পর্কে উপন্যাসে আছে :

> মিলের বাঁশকাটার মেশিনটা আজব জিনিশ, যেন রূপকাহিনীর রাক্ষস, প্রচণ্ড শব্দে কাজ করে চলেছে, বড় বড় বোন্দাগুলি নিমিষেই মিসমার। কাপ্তাইয়ের বিজলী ঘর, ছোড় দরওয়াজা, কলের এত শক্তি। এদের কাছে মানুষের মেহনত তো কিছুই নয়? পাহাড়কে বদলাচ্ছে, মাটিকে বদলাচ্ছে, যাদুমন্ত্রের মতো।[২৭]

যন্ত্রযুগের ক্রমান্বয় বিকাশ পূর্বেকার জীবনধারাকে দিয়েছে পাল্টে। তা দেখে ইসমাইলের মতো সরল স্বাপ্নিকেরা তো বিস্ময়াভিভূত হবেই। এ ব্যাপারে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কর্ণফুলীর তীরবর্তী অঞ্চলের যে উন্নয়ন প্রয়াস আর আধুনিক জীবন ধারার সূচনা বিধৃত, তাতে স্থানিক জীবনের ভাঙাগড়ার ইঙ্গিতময় ইতিহাস রেখায়িত।[২৮]

এ প্রসঙ্গে অন্য একজন সমালোচক বলেছেন :

> কর্ণফুলী নদী-তীরবর্তী জনপদের শ্রমজীবী-মানুষের অস্তিত্বরূপ ... একদিকে রয়েছে উৎপাদন কাঠামোগত বৃত্তাবদ্ধতা, অন্যদিকে, শ্রেণী-অস্তিত্ব অতিক্রমণের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা।[২৯]

চট্টগ্রাম থেকে উনআশি মাইল দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করে ফুলছড়ি পৌঁছেছিল রমযান, ইসমাইল ও সঙ্গীরা। রাতের পটে আঁকা অজানা রহস্যময় স্বপ্নের মত গ্রাম ফুলছড়ি। এখানে নিসর্গ, পাহাড়ী দৃশ্য মুগ্ধ করেছে ইসমাইলকে। অজানা ভাষার অচেনা সুরে ভেসে আসা গানও ইসমাইলের মনে অনুরাগ জন্মায়। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> কর্ণফুলী উপন্যাসে আলউদ্দিন আল আজাদ ফুলছড়ির নিসর্গ ও পার্বত্যদৃশ্যের বর্ণনা প্রদানসূত্রে ইসমাইলের মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়া ও আকাঙ্ক্ষাকে শব্দরূপ দিয়েছেন।[৩০]

ফুলছড়ি অবস্থানের পর প্রথম রাতেই রমযান ইসমাইলকে পরিচয় করিয়ে দেয় সেখানকার এক লোকের সঙ্গে। সে লোকটি অদ্ভুত ধরনের। তার নাম লালন— লালচাচা, পাগলাজামাই। সেখানকার মানুষের মধ্যে লালচাচার সঙ্গেই ইমাইলের প্রথম পরিচয়। চট্টগ্রাম তার আসল ঠিকানা। ফুলছড়ি এসেছিল সে বাঁশ কাটতে। আগের থেকেই চট্টগ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনের। সে সূত্রেই লালন বা লালচাচা চাকমা মেয়ে ধলাবিকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল এ পার্বত্য অঞ্চলে। একই কারণে এ অঞ্চলে আগমন ঘটে রমযানেরও। সে লালচাচাকে মদ-তাড়ি, টাকা দেয়। তবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে সে লালচাচাকে মদ-তাড়ি, টাকা দেয় না। এ তার পরিকল্পিত ব্যবসায়িক বিনিয়োগ যেন। সে নারী পাচারের 'গোপন ঠিকাদারী'র জন্যে, নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যে নজর রেখেছে লালচাচার অষ্টাদশী সুন্দরী মেয়ে রাঙামিল্যার ওপর। রমযান সব সময় নগদে চায় তার প্রাপ্য : টাকা ও মদ। যখন লালচাচা বলে, 'টেঁয়া দও। আর ইক্‌কিনি মালপানি'।[৩১] তখন রমযান বলে, 'আজিয়া অইব নি ? তইলে দিৎ পারি।[৩২] রমযান লালচাচাকে টাকা দেয় না, গভীর রাতে তাকে চাপ দেয় মেয়ে নিয়ে আসার জন্যে। রমযান বলে 'মাইয়ারে লই আয়, আর নইলে বন্দুক দি তর সিনা ছেদ করি ফ্যালায়ুম্।[৩৩] এতে মদ্যপ, দরিদ্র লালচাচার মনে তৈরি হয় গভীর প্রতিক্রিয়া। সে জেগে ওঠে প্রতিবাদী হয়ে, জেগে ওঠে তার আত্মসম্মান বোধ। লালচাচা ভাবে তাকে গলা টিপে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা।

ফুলছড়িতে রমযান জমি কিনে ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে ব্যবসার স্বার্থেই। অবৈধভাবে সে পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে আনে। বাঁশ সংগ্রহ করে তা চালান করা পর্যন্ত লেগে যায় অনেক দিন। সে সময় অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসার কাজ চালানো কঠিন। রমযান তাই জমি কিনে ঘর তৈরি করেছে ফুলছড়ি। এখানেই

তার ব্যবসায়িক বিষয় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সে কাজ করে। বাঁশ কাটতে যাওয়ার জন্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরাও ভোর বেলায় এসে কাজে যোগ দেয়। এমন কি পাহাড়ে তার বাঁশ বনের অদূরেও রয়েছে একটি ঘর। কাজের ফাঁকে নিজে এবং শ্রমিকেরা বিশ্রাম নেয় সে ঘরে। 'কামলারা বাঁশকাটে, এরপর চালি করে নদীতে ভাসায়।'[৩৪] এরপর এই 'বাঁশ চালান দিয়ে আপিস থেকে পাওয়া কড়কড়ে নোটের তাড়ায় বুক পকেট ভরবে রমযান, বাড়ি যাবে, আবার আসবে ;'[৩৫]

এমন করেই বাঁশের চালান, নারী পাচার, মদ-তাড়ি-সহ নানা ধরনের অনৈতিক অবৈধ ব্যবসায় জড়িত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে রমযান। রমযান অর্থ ও দাপট বজায় রাখতে গুণ্ডা পোষে। ইতু আর হাপু নামের দুই যুবককে টাকা দিয়ে পোষে নিরাপত্তার জন্যে। দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে আমাদের সমাজেও রয়েছে সম্পদশালীদের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী। তারা সব সময়ই অর্থদাতার কথা রাখতে সচেষ্ট থাকে। ইতু আর হাপু গুণ্ডাও তেমনই, তারাও রমযানের কথামতো চলে। রমযান ভেবেছিল ফুলছড়িতে ইসমাইল হবে তার ব্যবসার সহায়ক, পোষা গুণ্ডাদের অনুরূপ। কিন্তু ইসমাইল হয়েছে রমযানের জন্য ক্ষতিকর। সে ভালোবাসে রাঙামিল্যাকে, মিথ্যা অজুহাতে তাই রমযানের সঙ্গে সে কাজে যায় নি। শেষ পর্যন্ত রমযানের টাকাও আত্মসাৎ করেছিল ইসমাইল। তাই রমযান ইসমাইলের সব স্বেচ্ছাচারী কাজের শাস্তি দিতে চেয়েছিল ইতু ও হাপু — এই দুই গুণ্ডার মাধ্যমে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ও রাঙামিল্যাকে দখল করার জন্যে ইসমাইলের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। সেটা অবশ্য অনুমানে বুঝেছিল রমযান, ইতু ও হাপু গুণ্ডা। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> আঁর মনৎ লাগে ইসু ভাগি যাইব, মাইয়া ইবারে ভাইল কইজ্জে নি কনে জানে। যদি করি থাকে, ত ইয়ান ইক্কান মওকা। আঁরার এ্যান খাটন লাইগত ন।[৩৬]

তাদের ধারণা অনুযায়ী ইসমাইল পালিয়ে গিয়েছিল, তবে তা রাঙামিল্যাকে সঙ্গে নিয়ে নয়। সে বরং অনুসরণ করেছিল পালিয়ে যাওয়া প্রেমিক যুগল রাঙামিল্যা ও নীলমণি দেওয়ানকে অনুসরণ করে। এ অবস্থায় ইসমাইল ও রাঙামিল্যার ওপর প্রতিশোধের পথ রমযানের জন্যে হয়ে ওঠে সরল ; তাই রমযান তাদের পিছনে ইতু ও হাপু গুণ্ডাকে লেলিয়ে দেয়। কিন্তু গুণ্ডারা ইসমাইলের কাছে সহজেই পরাভূত হয়, নীলমণি দেওয়ানকেও ইসমাইল সহজে পরাজিত করে। ফলে নিষ্কণ্টক হয় তার প্রেম-সম্পদ ; কিন্তু ইসমাইল রাঙামিল্যাকে নিজের করে না নিয়ে প্রেমিকযুগলকে নিরাপদে পৌঁছে দেয় কাপ্তাই। এর পর থেকে ইসমাইলকে বা অন্য কোন লোক নিয়ে ফুলছড়িতে রমযানের ব্যবসায়িক তৎপরতা দেখা যায় না ।

পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ব্যবসার প্রবণতা তেমন নেই এ অঞ্চলে। ইসমাইলের মাধ্যমে দেখা মেলে কাপড়ের ব্যবসায়ী জগমোহনের। ইসমাইল পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি এসে ভালোবাসে রাঙামিল্যাকে। সে গরিব লালচাচার মেয়ে। টানাটানির সংসার। রাঙামিল্যার পরনে ময়লা-ছেঁড়া কাপড়। ভালোবাসার কারণে

রাঙামিল্যার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে ইসমাইলের। সে রাঙামিল্যাকে মলিন পোষাকে দেখে বেদনা বোধ করে। সে ভাবে, রাঙামিল্যাকে নতুন কাপড় উপহার দেবে। তাই সে ছুটে যায় কাপড়ের ব্যবসায়ী জগমোহনের কাছে। জগমোহন চট্টগ্রাম থেকে কাপড় পাইকারি কিনে এনে তা খুচরা বিক্রি করে পার্বত্য এলাকায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ...একটা একটা করে শাড়ি দেখাতে থাকে প্রত্যেকটারই নকশা বেশ সুন্দর; নীলরঙে ঘন করে লতাপাতা আঁকা একটা খুব পছন্দ হল।[৩৭]

পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের গার্হস্থ্য জীবনের কিছুটা পরিচয় ইসমাইলে মাধ্যমে পাওয়া যায়। কাসালং নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত চাকমাদের জীবনাচরণে নদীর রয়েছে গভীর প্রভাব। স্নান, রান্না ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয় এই নদীর পানি। নদীর এপার-ওপারে যাতায়াত চলে তালগাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি কোষা নৌকা দিয়ে। চাকমারা ব্যবসার কাজে ব্যবহার করে সাম্পান ও ঘাষি নৌকা। নদীর ঘাটে ঘাটেই দেখা যায় কর্মব্যস্ত পাহাড়ীদের। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> ঐ যে একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে, কাছেই, এপারে স্নান করছে চাকমা মেয়েরা, মাটির কলসী নিয়ে আসছে কেউ কেউ।[৩৮]

গ্রামের ভেতর কিছু দূর পর পর রয়েছে দোকান। সেগুলোয় বিক্রি হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। জনবসতি কম হওয়ার কারণে এখানকার হাট-বাজার দূরে দূরে অবস্থিত। ফলে প্রয়োজন হলেও তারা সব সময় হাট-বাজারে যেতে পারে না। তাই তারা স্থানীয় দোকান থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কেনে। স্থানীয় এ সব দোকানে চায়ের ব্যবস্থা নেই। ইসমাইল অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোন দোকানে চা পায় নি। সে ঘুরে বেড়ায় ফুলছড়ির পথ-প্রান্তরে ; 'পাঁচসিকি'তে নৌকা ভাড়া করে নদীতেও ঘুরছে সে। মাঝিরা নৌকা চালিয়ে সংসার চালায়। জীবন ধারণের এ পেশা আমাদের দেশে পুরানো। অনুন্নত সড়ক যোগাযোগের কারণে নৌ যোগাযোগই প্রধান। ফুলছড়ির পথ-প্রান্তর, পাহাড়-প্রকৃতি ও নদী সম্পর্কে একজন আলোচক বলেছেন :

> স্রোতস্বিনী-কর্ণফুলী, তার বুকে ভেসে চলে মাঝি, দু'পাশের জনপদ, পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা, সব মিলিয়ে একটি অঞ্চল বিশেষের জীবন-প্রকৃতির এক বর্ণাঢ্য চিত্র 'কর্ণফুলী' উপন্যাস।[৩৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের রয়েছে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি। তাদের সমাজে প্রচলিত 'ধনপতি-রাধামোহন' উপাখ্যানটির কথা রমযানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। লালন বা লালচাচার বিয়ে প্রসঙ্গে রমযানের বলা উপাখ্যান আর সে সমাজে প্রচলিত উপাখ্যানের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। চাকমাদের মুখে মুখে প্রচারের ফলে হয়তো তার রূপ বদল হয়েছে। উপন্যাস নির্মাণের খাতিরে ঔপন্যাসিক নিজ মেধা-মননের মাধ্যমে তাঁর কাহিনীতে যোজন-বিয়োজন করে থাকতে পারেন। পরিবর্তিত 'ধনপতি-রাধামোহন' উপাখ্যানটি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নরূপে :

> তন্ চাকমারা আছিল মাতামুরী নদীর টাকৎ। হিয়ানের এক গাঁওৎ ধনপতি নামে যে বড় সুন্দইজ্জা মাইয়া আছিল, আর লগের তিন সই সারাবি নীলাম্বী কুঞ্জারি। ধনপতি আছিল্ ব্যাকের পিয়ারা, তারে পাইবার লাই চারবন্ধু ঐ গাঁওয়ের সারাধন নীলাধন কুঞ্জাধন আর রাধামোহন— বড় আশক আছিল্। একদিন চার সই হম দরিয়াৎ গোসল কইত্তাছিল্ তন্ দ্যাহের দে চাইজ্জন বাঙালী কাইন্তে কাইন্তে আইয়ের। আর কি যেন কইতে লাইগ্যে। তা না দেখি ধনপতি আর তার সই অক্কল জলদি করি গাঁওৎ গেল গৈ। সারাধনের ফোঁয়ারে সাক্ষাৎ হৈতে তারে কইলো পুছার লইত ; ও যাই জাইন্‌লেঅ যে একদিন উজানপথে তারা যখন বাঁশ কাটিৎ আছিল তন তারা একখানা বড় গন্ধ পাইয়ে। বহুৎ খোঁজনের পর তারা পাহাড়ের শেষে কিনারায় যাই দেইখ্যে দে উগ্‌গা গাছ, গাছর মাঝে রুপার পাতা আর সোনার ফুল আর এই ফুলের তুন খুসবো বাহির হয়। তিনজন বাঙালী ফুল লইবার লাই দৌড়াই গেইয়ে আতিক্কা উগ্‌গা কালাবাঘ বাইর হই আইস্‌সে তার মাথাৎ উগ্‌গা শাদা তারা। ইবা আইয়ারে দুইজনের মারি ফ্যালাইরে। একজন কোনমতে জানে বাঁচি আইস্‌সে। ইবা আইয়ারে আবার দলের মাইন্‌ষের লগে মিললো সারাধন এগুন্ ধনপতিরে কইলো ; কিন্তু আজব গাছের কথাওয়া হাসি উড়াই দিল, কারণ হে বেবাক জায়গা চেনে তবিম্মা কোন দিন ন দেখে। কিন্তু, ও বিশ্বাস না কইরলে কি অইব: ঘটনা ইবা ধনপতির মনর মইধ্যে একখান ভাবনা জাগাই তুললো, জেনেই হোক এই গাছের তুন একখানা সোনার ফুল চাই। ইবাই তার রাইত দিনের চিন্তা। তার শরিল শুকাইয়া যাইৎ লাগিল। কবিরাজ ডাইক্কেতো কিছু ন হয়। তার অবস্থা চাইয়ারে তার সই-অক্কল মনমরা হই গেল গৈ। তোর কি হইয়ে আঁরারে খুলি ক, তারা বারবার কইত লাইগ্যে। শেষে ও তার মনের কথা খুলি কইলো। আর তারা বাপমারে কইলে তাঁরা মাইয়ারে বুঝানর চেষ্টা কইরলো। লেকিন কোন ফয়দা ন হইল। শেষে তারা ঢোল পিটাই দিইয়ে যে, যে মাইন্‌ষে এই ফুল আনিৎ পারিব তার লগে ধনপতির বিয়া দিব। এদ্দুর তো হইয়ে, এরপর চার বন্ধু গায় গায় যায়। সারাধন যে গেল আর ফিরি না আইলো, নীলধন আর কুঞ্জধনেরও একই হাল। শেষমেশ রাধামোহন কালাবাঘের মারি সোনার ফুল আইন্‌লো। এরপর দু'জনের মিলন হৈ গেল গৈ। ইবা, লালচাচাও বাঁশ কাট্‌তো আইয়্যারে আর ফিরি ন গেল।[৪০]

পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা সমাজে প্রচলিত 'ধনপতি-রাধামোহন' উপাখ্যানটি প্রসঙ্গত উপস্থাপিত করা যায়। উপন্যাসে সংযোজিত 'ধনপতি-রাধামোহন' উপাখ্যানটির তুলনা করা চলে প্রচলিত উপাখ্যানের সঙ্গে। উপাখ্যানটি নিম্নরূপ :

> সাধিংগিরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা, নাম কপতি। কপতির রূপের খবর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। অনেক অনেক রাজপুত্র কপতিকে পাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলো। সাধিংগিরি উপায়ান্তর না দেখে স্বয়ংবরা সভা ডাকলেন। এই সভায় কপতি জয়মঙ্গল নামে এক সামন্তরাজের গলায় মাল্য প্রদান করলো।
>
> জয়মঙ্গল ও কপতির দাম্পত্যজীবন খুব সুখেই কাটছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের মধ্যেও তাদের ঘরে কোন সন্তানসন্ততি না আসায় উভয়ের দুঃখের অন্ত রইলো না। ভগবান

> সহায় হলেন কপতি এবারে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো। তার নাম রাখা হলো ধনপতি।
>
> চম্পকনগরে আর একজন সামন্তরাজা ছিলেন। তাঁর নাম হরিশচন্দ্র। হরিশচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ছিল মেনকা। তাঁদের একটি মাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা ছিল- নাম যথাক্রমে রাধামোহন ও নীলপতি।
>
> কপতি ও মেনকা পূর্বে থেকেই পরিচিত ছিল এবং একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারতো না। কাজেই প্রায়ই দুজনের দেখা হতো। এ কারণে রাধামোহন ও ধনপতিকে প্রায়ই এক দোলনায় শুইয়ে রাখতে দেখা যেতো। ...রাধামোহন ও ধনপতি বড় হলো। তাদের মধ্যে দেখা দিল প্রেম। এই প্রেম তাদেরকে ঘরে টিকতে দিল না। একদিন সুযোগ বুঝে তারা পলায়ন করলো। তাদের খোঁজে চারদিকে লোক পাঠানো হলো। অবশেষে তারা এক নদীর কূলে ধরা পড়ল। সেখান থেকে গৃহে ফিরলে মহাধুমধামের সঙ্গে তাদের বিয়ে হলো।[৪১]

উপন্যাসে ধলাবি ও লালন বা লালচাচার বিয়ে প্রসঙ্গে উপস্থাপিত 'ধনপতি-রাধামোহন' উপাখ্যান বিষয়ে একজন সমালোচক মনে করেন, এটি 'ঘটনাবিন্যাস ও শিল্পসঙ্গতির প্রশ্নে অসঙ্গত'[৪২] তা ছাড়া 'লালন-ধলাবির বিবাহ চাকমাদের সমাজরীতি বিরুদ্ধ ; ফলত তারা সে সমাজে পরিত্যাজ্য। কিন্তু ধনপতি-রাধামোহনের সম্পর্ক চাকমা-সমাজে সমাদৃত ও নমস্য'।[৪৩]

ধর্মীয় বিষয়ে পার্বত্য অধিবাসীদের রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর আস্থা। 'খিয়াং' বলা হয় তাদের উপাসনালয়কে। তারা মনে করে ভগবানকে ডাকলে সে একদিন না একদিন সাড়া দেবেই। 'খিয়াং'-এ পূর্ণিমা 'মহামুণি'তে উৎসব হয়। এখানে আসে মগ, মুরং, চাকমাসহ সব পাহাড়ী-জাতি। এখানে এসে ছেলে-মেয়েরা এক অপরকে জানার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে জন্মাতে পারে ভালোবাসা। মন দেওয়া-নেওয়ার পরে তাদের সামাজিক ভাবেই বিয়ে হয়। লালন বা লালচাচার মেয়ে রাঙামিল্যা এসেছে 'খিয়াং'-এর উৎসবে প্রার্থনা করতে। রাঙামিল্যা তার প্রেমিক নীলমণিকে পাওয়ার প্রার্থনা করে, 'গৈরিক পোশাক পরা ন্যাড়া-মাথা ঠাকুর মূর্তির এক ধারে বসে আছেন।[৪৪] তিনি প্রার্থনা করেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি...[৪৫] রাঙামিল্যা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের সৌম্য মূর্তিকে বুকে ধারণ করে অতিক্রম করে সকল ভয়-ভীতি। চাকমারা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে গভীর আস্থাবান।

'কর্ণফুলী' উপন্যাসের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ফুলছড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইসমাইলকে করে তোলে রোমান্টিক। তার মনোজগতে ঘটে বিরাট প্রতিক্রিয়া-পরিবর্তন। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাঙামিল্যাকে প্রথম দর্শনেই। রাঙামিল্যাকে দেখে ইসমাইল রোমাঞ্চিত, শিহরিত, অভিভূত। অষ্টাদশী রাঙামিল্যার সৌন্দর্য সম্পর্কে উপন্যাসে আছে :

> বয়স আঠারোর মতো। চাকমা বটে, কিন্তু চেহারাটা বেশ চোখা, উঁচু নাক, চিকন গড়ন এবং একটু লম্বাও। গৌরী, তবে শাদাটে নয়, রক্তিম।[৪৬]

আবার, 'গালে ডালিমের রং, সোনার বরণ তনু... সাক্ষাৎ বনদেবী যেন বসে আছে।[৪৭] এই সোনার বরণ কন্যা রাঙামিল্যা লালন বা লালচাচা-পাগলা জামাইয়ের মেয়ে। তাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবাসে ইসমাইল। সে অন্তরাত্মায় অনুভব করে লিবিডোজাত দুর্বার আকর্ষণ। তাকে দেখার জন্যে সে অপেক্ষার প্রহর কাটায় পাহাড়ী ঝর্ণা ধারার কাছে। রাঙামিল্যা ঝর্ণাধারা থেকে কলসী ভরে পানি নিতে আসে। তাকে দেখে যেন মন ভরে না ইসমাইলের, সে ছুটে যায় লালচাচার বাড়ি। রাঙামিল্যাকে দেখতে ইসমাইল তার বাড়িতে গেলে ধলাবি ও লালচাচার বিষয়টি ভালো লাগে নি। তারা রাঙামিল্যার বিয়ে প্রসঙ্গে ভাবে। বিয়েযোগ্য মেয়ে সংসারে থাকলে বাবামার মনে দুশ্চিন্তা জাগা স্বাভাবিক। রাঙামিল্যার পরনে ছেঁড়া-ময়লা কাপড় দেখে ইসমাইল জগমোহনের দোকান থেকে একটি শাড়ি কিনে আনল। তার অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর রাঙামিল্যার জন্যে উপহার হিসেবে তার বাবা শেষ পর্যন্ত শাড়িটি গ্রহণ করল। তাতেও যেন মন ভরে না ইসমাইলের : সে রাঙামিল্যাকে উপহার দিয়েছে একটি সোনার আংটিও। ইসমাইল এর আগে আংটিটি দিয়েছিল জুলিকে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর কেরামতের মেয়ে জুলি। তাকে সে এক সময়ে ভালোবেসেছিল কিন্তু তাকে বিয়ে করতে চায় নি। সংসারের জালে জড়িয়ে গেলে সারেং হওয়া সম্ভব হবে না ভেবে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> যদি আছে দুই পাও, যেথা ইচ্ছা তথা যাও, যদি হবে চার পাও এই ব্যাটা কোথা যাও, যদি হবে ছয় পাও, আব্বাজান মিশ্রি দাও।[৪৮]

বিয়ে প্রসঙ্গে ইসমাইলের অসম্মতি জুলি বুঝতে পেরেছিল। তাই অভিমানে অপমানে সে ইসমাইলের দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সেই আংটিটি রাঙামিল্যা গ্রহণে অসম্মত হলে সেটি সে ফেলে দেয় কলসীর মধ্যে। ইসমাইলের প্রাণের এই তাড়না অসম্ভবরূপে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণবহুল।[৪৯] রাঙামিল্যা ভালোবাসে নীলমণি দেওয়ানকে। ফুলছড়ির অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কেনারাম দেওয়ানের পুত্র সে। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে তারা উচ্চে। সে তুলনায় ধলাবি-লালচাচার আর্থিক, সামাজিক অবস্থা বহুগুণে নিম্নে। ফলে নীলমণি ও রাঙামিল্যার বিয়ে হওয়া অনেক খানি কঠিন। এ বিষয়ে ধলাবি-লালচাচার মনেও আছে দ্বিধা। সে জানে, এ বিয়েতে কেনারাম দেওয়ান কোনভাবেই রাজি হবে না। তখন নীলমণি কি করবে সেটাই বড় কথা। কারণ, নীলমণিও দেওয়ানপুত্র।[৫০] এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া সামাজিক তারতম্যের বিষয়। ফলে নীলমণি ও রাঙামিল্যার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা ভিন্ন পথ ছিল না। সে কাজটি সামাজিকভাবে অপরাধযোগ্য হলেও, বিচার করে তাদের জরিমানা করার পর কিছুদিনের মধ্যেই সবাই তা ভুলে যাবে, এ কথা জানে তারা। তারাও সমাজে গৃহীত ও সমাদৃত হবে ঠিক ধনপতি-রাধামোহনের মতো।

গভীর রাতে মা-বাবা যখন ঘুমন্ত অবস্থায়, তখন নীলমণির সবুজ সংকেতে ঘর থেকে বের হয়ে আসে রাঙামিল্যা। তারা ছুটে চলে কাপ্তাইয়ের পথে। সেখানে নীলমণি

চাকুরি ঠিক করেছে। কাপ্তাই গিয়ে তারা গড়ে তুলবে ভবিষ্যৎ জীবন কিন্তু তাদের অভিযান হয় বিপদগ্রস্ত। তাদের পিছু নেয় প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসমাইল। সে সাহসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, যেমন করেই হোক অধিকার করবে রাঙামিল্যাকে। ইসমাইলের পিছু ছুটছে আবার ইতু ও হাপু গুণ্ডা। তাদের পাঠিয়েছে রমযান, তার অবাধ্য ইসমাইলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। তা ছাড়া রাঙামিল্যার জন্যে রমযানের রয়েছে লালসা। সে রাঙামিল্যাকে চেয়েছিল তার বাবা লালচাচার কাছে : মদ, তাড়ি, টাকার বিনিময়ে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যে। রমযান আরও ভেবেছিল তার 'গোপন ঠিকাদারি'র ব্যবসায়ও লাগাতে পারবে রাঙামিল্যাকে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> রাঙামিল্যার প্রতি ইসমাইলের রোমান্টিক আকর্ষণ আর রমযানের কামাতুর লিপ্সার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে লেখক সংকেতে সন্ধান দিয়েছেন মধ্যবিত্তের দুই স্ব-বিরোধী সত্তার।[৫১]

শেষ পর্যন্ত ইসমাইলের শক্তির কাছে পরাজিত হয় ভাড়াটে গুণ্ডা হাপু ও ইতু। তারা ইসমাইলের আঘাতে পাহাড় থেকে পড়ে যায় কর্ণফুলী নদীর পানিতে। অন্যদিকে নীলমণিকেও ইসমাইল খুব সহজে পরাজিত করে। অতঃপর ইসমাইল অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত প্রেম-সম্পদ। 'ইসমাইল যেন এ্যাডভেঞ্চারের এক অন্তর্বাহী নেশায় চঞ্চল। কর্ণফুলীর তীরের খণ্ডজাতি জীবনের যে পরিচয় উপন্যাসে বিধৃত, তা যেন এই নেশারই উস্কানির ফল।'[৫২] চাঁদের আলোর বন্যায় স্নাত ইসমাইলের অন্তর্জগত আশ্চর্যরূপে বদলে যায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> ইসমাইল একটু স্থির হয়ে চাঁদের আলোতে দেখে ওর পদ্মের মতো মুখটা : তারপর হাত বাড়িয়ে ওকে আগলে বুকের কাছে ধরে বলল, ন ডরাইও। চল জলদি। দোছরা পথ দি যওন পড়িব।[৫৩]

ইসমাইল রাঙামিল্যা ও নীলমণিকে নিরাপদে কাপ্তাই পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রওয়ানা দেয়। কর্ণফুলী নদীর বুকে গভীর রাতের আছড়ে পড়া চাঁদের আলোয় ইসমালের মনোজাগতিক পরিবর্তন যেন প্রকৃতি ও মানুষের চিরকালীন সম্পর্কের কথাই নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের কথা উল্লেখ করা যায় :

> কখনও নদী জীবনের বাঁকে বাঁকে জুড়ে থাকে... কোথাও নদী হয়ে ওঠে অনিবার্য এক পটভূমি... কোথাও নদী এক বা একাধিক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়... কোথাও বা নদী সামাজিক ও ব্যক্তিজীবন পটপরিবর্তনে নেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[৫৪]

'কর্ণফুলী' উপন্যাসে পার্বত্যাঞ্চলীয় জীবন বাস্তবতার বিষয়টি যেন আড়াল হয়ে যায় প্রেমের কারণে। যা ক্রমে হয়ে ওঠে 'স্বপ্ন বিভোর যুবক-যুবতীর প্রেমের উপাখ্যান।'[৫৫] এ জন্যে বলা হয়েছে :

> আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের রোমান্টিক প্রমোপাখ্যান।[৫৬]

ইসমাইল ফিরে আসে চট্টগ্রাম শহরে। কয়েকদিন বিশ্রাম করে শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করে। সে জেগে ওঠে ফুলছড়ির প্রকৃতি আর রাঙামিল্যার প্রেমের ঘোর

থেকে। 'ঘিঞ্জি হোটেলের পেছনে লম্বা-মতো কুঠরী'[৫৭]-তে থেকে তারই বাঁশের বেড়ার বাইরে 'কেরোসিন কাঠের ছোট্ট টেবিল, নড়বড়ে চেয়ার ও একটি টুল— রীতিমতো দপ্তরই খুলে বসেছে পটিয়ার মুন্সি।'[৫৮] সে অনেক হাবাগোবাকেও সারেং হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে 'নলি' বা সারেং হওয়ার সনদ পাইয়ে দিয়ে। 'নলি' পেতে একশ থেকে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। মুন্সি অপেক্ষাকৃত কম টাকায় 'নলি' সংগ্রহ করে দেয়। সংশ্লিষ্ট অফিসের এক আত্মীয় অফিসারের মাধ্যমে সে এই কাজ করে। এই কাজের মাধ্যমে মুন্সি আর্থিকভাবে হয়েছে লাভবান । এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> একটি নলির জন্য একশ' টাকা নেহাৎ সামান্য, তিনশও নেয় কেউ কেউ। এ তো রেজিস্ট্রেশন কার্ড, পাওয়া সোজা নয়। অফিসার লোকটি মুন্সির আত্মীয়, তাই তার পক্ষে একটু সস্তায় সম্ভব হচ্ছে। একশ'র নীচে নামে না কখনো। মওকা পেলে বেশিই নেয়।[৫৯]

এই নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে উঠেছে মুন্সির পরিচিতি। 'নলি' প্রত্যাশী সকলেই এখানে মুন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে। ইসমাইলও তার কাছে এসেছে 'নলি'র জন্যে। সে তার আঞ্চলিক জীবন ও পরিবেশ থেকে অর্জন করেছে সারেং হওয়ার সুতীব্র ইচ্ছা। সমাজের ভেতর-বাইরের ঘটনাদির অন্তর্চক্ষু অবলোকন সম্ভব হয় ঔপন্যাসিকের 'গ্রামীণ বা আঞ্চলিক' জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিলব্ধ সঞ্চয় থেকে।[৬০] কর্ণফুলী উপন্যাস নির্মাণের জন্যেই ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম। ফলে উপন্যাসে চিত্রিত করা সম্ভব হয়েছে আঞ্চলিক জীবনের ব্যপ্তি এবং কিছুটা গভীরতাও।[৬১] উপন্যাস সামাজিক যোগাযোগের সাহিত্যিক দলিল[৬২] বলেই আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস হয়ে উঠেছে সমাজের ইতিহাস, ব্যক্তির অভিযাত্রা এবং তার আত্মিক সঙ্কট ও অন্বেষণের অদ্বিতীয় রূপকল্প।[৬৩]

সমতল চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বস্তিতে ইসমাইল ফিরে আসে তার মা মানু বিবির কাছে। তার অনুপস্থিতিতেই তৈরি হয় সমস্যা, আত্মীয় কেরামতের মেয়ে জোলায়খা বা জুলিকে নিয়ে। বিয়েযোগ্য মেয়েকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করার তাগিদই দরিদ্র কেরামতকে সারাক্ষণ চিন্তিত রাখে। তাছাড়া গরিব বলে সে ছেলেমেয়েকে চাহিদামত জামা-কাপড়ও কিনে দিতে পারে না । জুলি তার পিতা কেরামতকে শাড়ি কাপড় আনতে বলেও তা পায় নি। তার জামাকাপড়ও নেই ঠিকমতো। এমন কি এক আনা দু আনা জমিয়ে কেনা সুবাসী তেলটিও গেছে শেষ হয়ে। চরম দারিদ্র্যপীড়িত মেয়ে জুলি। তার বাবা কেরামতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ফখরী তার বান্ধবী। কিছুদিন আগে হওয়া তার বিয়ের মাধ্যমে পাহাড়তলী বস্তিবাসীদের বিয়ে সম্পর্কিত পরিস্থিতি জানা যায়। বিয়েতে তারা অলংকার, প্রশাধনী দ্রব্যসহ শাড়ি-চুড়ি সবই পেয়েছে। ফখরীও বিয়েতে পেয়েছে সোনার চেন, রূপার আংটি, আলতা, পাউডার ইত্যাদি। সমবয়সী-বান্ধবীর সুখের জীবনের সঙ্গে নিজ জীবনের তুলনা করে হতাশ হয় জুলি। সংসারের স্বপ্নাবেশেই ইসমাইলের ভালোবাসার প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে। কিন্তু

ইসমাইল বিয়েতে আগ্রহী নয়। সে সারেং হওয়ার স্বপ্নে বুক বেঁধে আছে, তার মা মানুবিবি জুলির সঙ্গে তার বিয়ের কথা তুললেও তার দেখা যায় নি কোন ভাবান্তর। বিয়ের ক্ষেত্রে ইসমাইলের অনাগ্রহ গোপনে লক্ষ করে জুলি। এ প্রসঙ্গে সে বলে :

> কেরামতের মেয়ের কথা শুনে মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে আসতে পারত, মুখে ফুটতে পারত গোপন হাসির আভাস। কিন্তু সব বৃথা, আশা দুরাকাঙ্খা মাত্র, একটু রঙের কথা বলা, মনের কথা নয়। আর সোনার আঙটি? একদম ভাঁওতা। দোকান থেকে চুরি করা জিনিস, বিক্রি করতে না পেরে গছিয়েছে।[৬৪]

এভাবে আংটি ফেরত দিয়ে ইসমাইলের সঙ্গে ভালোবসার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল জুলি। জুলিকে ইসমাইলের সঙ্গে জুলির বিয়ে দেওয়ার জন্যে মানুবিবি গভীর আগ্রহী। জুলি তার মেয়ের মতো, সাংসারিক নানা কাজে সে সাহায্য করে। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও জুলি তার বাবার সংসার থেকে যতটা পারে এনে দেয় তার ফুফুকে। তা ছাড়া ইসমাইল ও জুলির মধ্যে তৈরি হওয়া প্রেমের সম্পর্কটিও তার চোখ এড়ায় নি। ফলে জুলির প্রতি মানুবিবির জন্মে দরদ। সে তাকে তার পুত্রবধূ করতে চাইলেও বিষয়টি এখনও সে গোছাতে পারে নি। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে বিচলিত হয় কেরামত। সে ঘটক গণু মুন্সির মাধ্যমে চেষ্টা করে জুলির বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিয়ের ক্ষেত্রে ঘটকালি বা ঘটকের প্রচলন আমাদের সমাজে বহুকাল থেকে। ঘটক বিয়েতে মধ্যস্থকারীর দায়িত্ব পালন করে। কখনও কখনও ঘটকরা বিশেষ কারণে পক্ষপাতিত্ব করে, হয় কন্যা পক্ষের, নয় বর পক্ষের। তাতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। মূলত তারা তথ্য গোপন করে এবং কৌশলে দুই পক্ষকে সম্মত করিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। ঘটকদের এই ধরনের তৎপরতা লক্ষ করা যায় জুলির ক্ষেত্রেও। গণু মুন্সির প্রস্তাবিত পাত্রের নাম মুকিম গাজি। সে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক অর্থের মালিক হয়েছে। তার বয়স চল্লিশের অধিক। তার প্রথম স্ত্রী পাঁচজন সন্তান রেখে মারা গেলে, দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় সে। বিপত্নীক-বয়স্ক এই পাত্রকে জুলির জন্য উপযুক্ত বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে ঘটক একের পর এক যুক্তি দেয়। এমন কি জুলিকে দেখতে আসার তারিখ নির্ধারণ করে এবং তখনকার খরচ বাবদ টাকাও দিয়ে যায় গণু মুন্সি। কেরামত টাকা রাখতে না চাইলেও অভাবের সংসারে তার স্ত্রী টাকার লোভ সামলাতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে জুলির মা বলে, 'পঞ্চাশ টেঁয়া দিইয়ে মনে হয় ভালোই অইব। তুঁই কি কও ?[৬৫] অভাবের কারণে মানুষের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি যেন লোপ পায়। দরিদ্রতার ভয়াবহ এই পরিণতি নির্দেশ করে কর্ণফুলীর সমতল অঞ্চলের দরিদ্র মানুষর জীবন সমস্যার স্বরূপ। জুলির অমতে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে যায়। তবু জুলি মুখ ফুটে বলতে পারে না তার মনের কথা। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীরা পরাধীন যেন। জুলি তার আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চলে যায় ফুফু মানুবিবির কাছে। জুলি বলে :

> আঁই বাজীর কথা হুনি আস্‌ সি। এক ব্যাডা আই তেঁরে টেঁয়া দিইয়ে। উগ্‌গা বুইজ্জার কাছে আঁর বিয়া দিব।[৬৬]

মানুবিবি বিচলিত হয়ে ওঠে : তার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে ছেলে ইসমাইল। তাই সে অনেক অনুরোধ করে আবুকে কাসালং পাঠায় ইসমাইলের খোঁজে, প্রতিবেশী মক্কী সাহেবের ছেলের মাধ্যমে লেখানো একটি চিঠি দিয়ে। মানুবিবি লিখতে জানে না, সেখানে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যাও কম। দরিদ্রতার কারণেই হয়তো এখানে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি তেমন একটা। এরই মধ্যে ইসমাইল ফিরে আসে পাহাড়তলীর এবং জানতে পারে তার মায়ের কাছে জুলির বিয়ে সম্পর্কিত বিষয়।

ইসমাইল জুলির বিয়ের সংবাদ শুনে বিচলিত হয়। তার উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কিছুদিন আগেই তো সে তাকে ভালোবেসে দিয়েছিল আংটি উপহার। ফুলছড়ি থেকে ফেরার পর রমযানের নিয়মিত পতিতা নারগিসের ঘরেও যায় নি সে জুলির কথা ভেবে। ফুলছড়ি থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় জুলির জন্যে আনে চুল বাঁধবার ফিতা, জুলিকে ভালোবাসে বলেই হয়তো সে ফিরে এসেছে পাহাড়ী কন্যা রাঙামিল্যাকে ছেড়ে। তাই বিপত্নীক পুরুষের সঙ্গে জুলির বিয়ের প্রস্তুতির কথা শুনে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া। তার মায়ের মাধ্যমে সে জুলিকে ডেকে আনায় নিজের ঘরে। জুলি অভিমান করে আসতে চায় নি, শুনতে চায় না ইসমাইলের কোন কথা। ইসমাইলের উদাসীনতার জন্যেই জুলির বর্তমান অবস্থা তৈরি হয়েছে। তাই জুলির ভাবনা ভিন্ন, সে চায় না ইসমাইল তার সুখ-দুঃখের কোন খবর রাখুক। জুলির অভিমানের ভাষা এ রকম :

> হ্যাঁ এতদিনে কথা আছে। বলুক না, ঝাঁপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকরে, কিছ্ছু শুনবে না। কয়দিনে অনেক বড় হয়েছে সে, সব বুঝতে পারে। ভালোই হল। জামাই বুড়োই হোক না, দুঃখী বাপমায়ের মুখে তো হাসি ফুটেছে ?[৬৭]

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হয়েছে অন্য রকম। পাহাড়ী কন্যা রাঙামিল্যাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলেও, সে জুলিকে অধিকার করে নেয় জোরপূর্বক। মায়ের কাছ থেকে ইসমাইল জুলিকে টেনে ঘরে নেয় এবং আলো নিভিয়ে দেয়। এতে তৈরি হয় একটা অশান্ত পরিস্থিতি। জুলির মা-বাবা তাকে খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। মেয়ের অমতে বিয়ের কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে, এমন ধারণা জন্মে তাদের মনে। সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে বিষয়টি পুলিশে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত না হওয়ায় তারা তা করে নি। এ সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানুবিবি। সে ঘটনাটি নিজেদের মধ্যে গোপন করার কথা ভাবে। পাড়া-পড়শি জানলে সকলেরই সম্মান নষ্ট হবে। তাই মানুবিবি ঘটনাটি জানায় জুলির মাকে। জুলির মা-ও নিজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে বিষয়টি গোপন করে। ইসমাইল পূর্ব পরিকল্পনা করেই জুলিকে বাধ্য করেছে দৈহিক মিলনে। কেননা, 'নষ্ট মেয়েকে কেউ বউ করে নিতে চায় না।'[৬৮] অবশেষে ইসমাইলের সঙ্গেই বিয়ে হয় জুলির। তবে ইসমাইল ঘটক গণু মুন্সির আনা পাত্রকে ফিরিয়ে দেয় তার খরচ হওয়া টাকা ফেরত দিয়ে। পাহাড়তলীর বস্তিবাসী শ্রমিক-মজুর সমাজের এ যেন আর এক চিত্র। ইসমাইলও বিয়েতে মোটামুটি খরচ করেছে। জুলির বান্ধবী

ফকরীর বিয়ের মতোই জুলি বিয়েতে পেয়েছে শাড়ি, অলঙ্কারসহ অন্যান্য সামগ্রী। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে উল্লেখ আছে :

> একটা সোনার চেইন দিয়েছে, আর চারগাছি চুড়ি। শাড়িটাও মন্দ নয়। খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যও একটা খাসি ও নগদ কিছু দিয়েছিল। হাজার টাকার কাবিনের ব্যাপারেও পিছপা হয় নি।[৬৯]

আবেগ উচ্ছ্বাসভরা দাম্পত্য জীবন শুরু হয় ইসমাইল ও জুলির। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে জুলি, এর আগে কখনো সে সিনেমা দেখে নি, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে নি, দেখে নি সমুদ্র সৈকত। এতদিন সে বুঝতেও পারে নি যে পৃথিবীটা এত বড়। সিনেমার কাহিনীর সঙ্গে জীবন বাস্তবতার মিল নেই, জুলি তা সিনেমা দেখে বুঝতে পারে। এ প্রসঙ্গে সে ভাবে :

> সব একদম জীবন্ত। কথা বলে, হাসে, গান গায়। নাচে, পীরিত করে, কি অদ্ভুত। জীবনও এত সুন্দর হতে পারে। চারদিকে যে কেবল দীর্ঘশ্বাস, কান্না, উপবাস! তবে রূপালি পর্দার এই সমস্ত সত্যি নয় ? ছবি দেখতে দেখতে স্বপ্নরাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।[৭০]

সংসার জীবনের কিছু দিন যেতে না যেতেই ইসমাইল কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। বিচলিত হয়ে ওঠে সে ভবিষ্যৎ ভাবনায়। কিভাবে চলবে সংসার, স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান। অনাগত সন্তানের জীবন-ব্যয়ভার, তা ছাড়া সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর আলাদা যত্ন নেওয়ার বিষয়েও সে সজাগ। সন্তানসম্ভবাকে খেতে দিতে হয় ভালো খাবার, নানা ফল। সে স্ত্রীকে এসব দিতে পারে না বলে গভীর হতাশায় ভোগে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> ...ফলের দোকানের সামনে দিয়ে বাসায় যাওয়ার সময় আফসোস হয়, ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে, কিছু খাওয়াতে পারে নি। না ফল না মিষ্টি না দুধ ডিম। অথচ এগুলো কত দরকার। কেবল শাকসুটকি খেলে বাচ্চার মগজ হয় না।[৭১]

অর্থ আয়ের কোন পথ পায় না ইসমাইল। টাকা ছাড়া চলে না, চলবে না সংসার। কোন না কোন কাজ করে অর্থ সঙ্কট ঘোচাতে হবে। টিকিয়ে রাখতে হবে স্ত্রী-সন্তান-পরিবার। অনেক ভেবে-চিন্তে সে কুলির কাজ করতে যায়। এ কাজ নিজের জন্য লজ্জার হলেও অন্য কোন উপায় ছিল না তার। সংসার ঠিক রাখতে গিয়ে সে ভুলে যায় সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

এমন দুর্দিনে ইসমাইল ইংরেজ কোম্পানির সারেং নেওয়ার খবর পায়। পটিয়ার মুন্সির সঙ্গে সে যোগাযোগ করে চাকরির আশায়। সারেং-এর চাকরি পেতে প্রতিযোগিতার কমতি নেই। 'নলি' বা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সারেং দু শর মতো। আর সারেং-এর চাকরিতে নিয়োগের পদ ছিল মাত্র বিশটি। তীব্র লড়াই হবে এক একটি পদের বিপরীতে। প্রত্যেকেই চেষ্টা তদবির করবে 'সারেং'-এর চাকরি পেতে। এত প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার ক্ষেত্রে ইসমাইলের মনে রয়েছে নানা সন্দেহ। তাই সে মুন্সির মাধ্যমেই ঘুষের বিনিময়ে চাকরিটি পাওয়ার আশা করে। মুন্সি পাঁচশত টাকার

বিনিময়ে কাজটি করে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু এত টাকা ইসমাইলের নেই। তার হাতে আছে দেড় শ টাকা মাত্র। আর আছে বসত বাড়িটি। মনে মনে ভাবে তা বিক্রি করে ফেললে, থাকবে না মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। এমন পরিস্থিতিতে ইসমাইল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে রাজী হয় পকেটমারের সর্দার রূপার দেওয়া প্রস্তাবে। মালভরা নৌকা লুট করবে তারা। তা থেকে কিছু হাতিয়ে আনতে পারলে চলে। উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে :

> চোরাই মাল বোঝাই একটি নৌকা সমুদ্র থেকে নদী দিয়ে ঢুকে শহরের ঘাটে আসবে সেটা লুট করা। বাঘের ওপরে ঘোগের চড়াও। বড় সাম্পান, লোকজন থাকে বেশ। তাই এ দলটিকেও ভারী হওয়া দরকার।[৭২]

সারারাত ওঁৎ পেতে থেকেও তারা পায় নি মালভরা নৌকার হদিস। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে তারা। এমতাবস্তায় ইসমাইলের 'ঘরে কিছু নেই'। অচল সংসার চালাতে জুলি তার 'একগাছি চুড়ি' বন্ধক রাখে। তাতে পাওয়া অর্থ দিয়ে দিন চালায় । বন্ধকী ব্যবস্থা রয়েছে এ সমাজে। সবদিক থেকে অসহায় হয়েই বন্ধক দেয় 'চুড়ি' এবং সে ভাবে এভাবে বেশিদিন ভালো থাকা যাবে না। ইসমাইলও একটি কাজ পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। সে তার পরিচিত আলীর মাধ্যমে খবর পায় সদাগরী অফিসে পিওন পদের চাকরি খালি আছে। সেখানে চাকরি প্রায় ঠিক হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি, গণ্যমান্য দু জন মানুষের সুপারিশের অভাবে। কেউ তাকে সুপারিশ করে নি, পকেটমার বলে পরিচিতির জন্যে। পকেটমারের কাজ ইসমাইল ছেড়ে দিলেও তার বদনাম ঘোচে নি। ফলে ঝুঁকি নিয়ে কেউ তাকে চারিত্রিক সনদ দেয় নি।

ইসমাইল বাস্তবতার যাতাকলে পিষ্ট। অনেক চেষ্টা করেও সে মেলাতে পারে না একটি আকাঙ্ক্ষিত কাজ। চরম অর্থ সঙ্কটের সময় সে হাত পাতে পরিচিত আলীর কাছে। দু টাকা ধার করে কেনে সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, জুলিকে খুশি করার জন্যে কেনে এক বোতল 'সুবাসী তেল'। ইসমাইলের মনে শান্তি নেই। সে ভাবে কিছু টাকা পেলে কাজ-কারবার করতে পারতো। কিন্তু কোনভাবে টাকা বের করার পথ নেই তার, শুধু 'শ'দেড়েক টেঁয়ার অলংকার' ছাড়া। সে অলংকার 'অসুখ-বিসুখে'র সম্বল বলে ভাবে জুলি। কোন পথই যেন নেই, এ অবস্থায় জুলি ইসমাইলের 'নলি' বিক্রির কথাও ভেবেছিল। কিন্তু তা বিক্রি করতে ইসমাইল কোনমতেই সম্মত নয়। সারেং হওয়ার স্বপ্ন 'চরম জেদ আর একাগ্রতার মাধ্যমে সে তা পূর্ণ'[৭৩] করবে। কিন্তু স্বামীভক্ত জুলি ইসমাইলের সারেং হওয়া, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া পছন্দ করে না। তাই সে তার সারেং হওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু কোনভাবেই ইসমাইল সারেং হওয়ার স্বপ্ন থেকে বিরত হয় না। অবশেষে জুলি উপায় না পেয়ে ইসমাইলকে সারেং হওয়ার অনুমতি দেয়। এর পরই ইসমাইল অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করে সারেং হওয়ার সৌভাগ্য। দু জন পরিচিত কারবারী এসে, বাড়ি থেকে ইসমাইলকে নিয়ে যায় তাদের গোপন অফিসে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> তুই সেরাং হইবা ! শাদামাটা বলল, ক্যান্ গরি ইয়েন তোঁয়ার চিন্তা করন পইত্ত নয়। তোঁয়ার নলি আছে এতই অইব। পাসপোর্ট অন্য ব্যবস্থা, বাকি সব আঁরার এক হাজার দু'হাজার তিন হাজার যা লাগে।[৭৪]

আকস্মিকভাবে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়ে ইসমাইল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। কারণ, জুলির কাছে ইসমাইল বিষয়টি বলতে পারবে না, কেননা সে তাকে যেতে দেবে না। আবার জোর করে গেলেও জুলি কাঁদবে, সব সময় থাকবে শঙ্কিত-উদ্বিগ্ন। অথচ এরপর সারেং হওয়ার এমন সুযোগ পাওয়া হয়তো কঠিন হবে। এই ভেবে ইসমাইল কারবারীদের কাছ থেকে টাকা অগ্রিম নিয়ে বাজার-সওদা করে বাড়ি পৌঁছে। সে নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলির কাছে সত্য কথা বলে না। ইসমাইলের ভয় হয় ইতু ও হাপু গুণ্ডাদের, তার অনুপস্থিতিতে তারা ক্ষতি করতে পারে জুলির। তা ছাড়া জুলি ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে মা মানুবিবির কথা 'তুই যাতি চাস, আঁরে মাডি দি যা' [৭৫] — এই পরিস্থিতিতে ইসমাইলের মনে জন্মে দ্বন্দ্ব। সে বলে 'মুশকিলৎ-ই পড়্গি'। জুলি স্বামীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট বুঝতে পারে। তাকে সাহায্য করার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই সে ইসমাইলকে বলে :

> আঁই কই হারখানা বেচি হাঁস মুরগী আর কোয়া ছাগলী কি ন। হেগুন আঁই পাইল্লুম। কিছুদিন পরে পরে বেচন যায়, বেশ পয়সা। বাকি টেঁয়ার তুঁই কিছু গর। কাঁচাসুপারি আনি শুকাই বেচিলে মন্দ নয়। হালাল মেন্নৎ, বরকত আছে।[৭৬]

ইসমাইলের কাছে জুলির এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তবু তার দ্বান্দ্বিক মন খোঁজে বিকল্প আয়ের পথ। সে স্বপ্ন দেখে, কর্ণফুলী বিদ্যুৎ প্রকল্পে একটি কাজের। এখানে একটি কাজ হলে তাকে অর্থের জন্যে যেতে হবে না বিদেশে। কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী আড়াই শ মাইল দীর্ঘ এলাকায় চুরাশি হাজার লোকের বসবাস। বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এই বিস্তৃত অঞ্চলের লোকদের সরকার অন্যত্র জমি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। পিতা-মাতার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে তাদের কষ্ট হলেও তারা অন্যত্র গেছে দেশের কল্যাণে। এখানেই তৈরি হবে বিদ্যুৎকেন্দ্র। তাতে জ্বলবে আলো, চলবে কল-কারখানা, উৎপাদিত হবে নানা পণ্য, মানুষ পাবে কাজ, ঘুচবে বেকারত্ব-দারিদ্র্য। এই প্রকল্প কর্ণফুলীর তীরবর্তী মানুষের আঞ্চলিক জীবন প্রবাহের ঘটিয়েছে পরিবর্তন । এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> নগর ও যন্ত্রায়ণের থাবা নিস্তরঙ্গ আঞ্চলিক জীবন কাঠামোতেও যে পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলেছে ঔপন্যাসিক সম্ভবত তার গতি-প্রকৃতি অঙ্কনে সচেতন ছিলেন গোড়া থেকেই।[৭৭]

ইসমাইল কোনভাবেই সারেং হওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না। জুলিও বুঝতে পারে তাকে সে পথ থেকে ফেরানো যাবে না। তবু, চরম হতাশার মধ্যেও জুলি ইসমাইলকে অভয় দিয়ে বলে :

> কাপ্তাই বহুৎ বিরাট কারখানা হব্, ফিরি আইলে ভালা চওরির আশা। হেত্তে আর বিদেশ যাইতাম নয়, তোঁয়ার লগেই থাইক্‌কুম।[৭৮]

অবশেষে ইসমাইলের সারেং হিসেবে জাহাজে চড়ার দিন-ক্ষণ উপস্থিত হয়। সকলে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে জাহাজ ঘাটে যায়। জুলিকে দেওয়া শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও তার মন মানে না। অভাবের সংসারে স্বামীই তার একমাত্র অবলম্বন, তাকে দূর দেশে যেতে দিয়ে সে হবে নিঃস্ব। অসহায় নারী তাই স্বামীর জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা করেই যেন তৃপ্ত : যেখানেই যাক সে যেন আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। স্বামীর প্রতি তার এই অসীম দরদই 'জুলির মত একজন সর্বংসহা প্রেমিক নারীর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের নাড়ির যোগ'[৭৯] ঘটিয়েছে। স্বামীর প্রতি দরদ আর মঙ্গল প্রার্থনার বিপরীতে তার মনে জন্মেছে এক ধরনের অবিশ্বাসও। সে অবিশ্বাস শুধু সারেং ইসমাইলের ওপর নয়; তা সমস্ত সারেংদের ওপরও প্রযোজ্য। তারা বিদেশী 'মেম' বা মেয়ে বিয়ে করে ভুলে যায় দেশের স্ত্রী-সন্তানের কথা। সে অবিশ্বাসের আগুনে জ্বলে জুলি প্রলাপ বকে যেন, সে বলে :

> আর যদি বিয়া গরই, তইলে এ্যান চাই গরিবা যেন্ আঁইও থাইৎ পারি।[৮০]

পতিপ্রাণা বাঙালি নারী হৃদয়ের আকুতি, আজীবন স্বামীর আশ্রয়ে থাকার দীপ্ত বাসনা-এ যেন। জাহাজ ঘাটে সারেংদের বিদায় দেওয়ার জন্যে আত্মীয়রা এসেছে, তারা সকলেই বেদনাক্রান্ত। তাদের কান্না বিজড়িত ভাব-ভাষায় ভারী হয়ে গেছে জাহাজঘাটের বাতাস। এমন পরিস্থিতিতে ভেঁপু বাজে জাহাজের। সারেংদের বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা জাহাজ থেকে নেমে যায়। জাহাজ থেকে নামতে হয় জুলিকেও, সে যেন নামতে চায় না। যেতে চায় সে স্বামী ইসমাইলের সঙ্গে। তার মনে জাগে নারী জন্মের সীমাদ্ধতার কথা। নারীর বিচরণের স্থান যেন ঘর সংসারই। সে যদি জাহাজে যেতে পারত, দেখত নতুন দ্বীপ, পাখির ঝাঁক, কত বাজার-বন্দর আর মানুষ। পাহাড়ী-উড়িয়া মেয়েদের স্বাধীন চলাচলের সঙ্গে তুলনা করে নিজ অবস্থার। তারা হাট-বাজারে শ্রম বিক্রি করে, অর্থ উপার্জন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে তারা স্বাবলম্বী। তাতে তাদের সতীত্ব যায় না। জুলির কথায়, সতীত্ব নিজে না হারালে তা নষ্ট হয় না। সে ভাবে নারী হয়ে জন্মানোর অভিশাপের কথা। আসলে, নারী বা পুরুষ জন্মের বিষয়টি মুখ্য নয়, পরিস্থিতিটা নির্ভর করে সমাজের ওপর, সমাজের মানুষের ওপর। সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে নারী স্বাধীনতাও হবে নিশ্চিত। তার মনের গুমোট বাঁধা বেদনার ভাষা যেন ছড়িয়ে যায় দূর সমুদ্রের দিগন্তে :

> তার দুই চোখের অবিরল অশ্রুধারা কর্ণফুলীর প্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছে একটি রেখায় জীবন্ত ফিতার মতো... সামনে শুধু নীল আসমান, আর থই থই দরিয়া। কূলকিনারাহীন, অনন্ত।[৮১]

অবসন্ন, বিষণ্ন, বিরহ কাতর এই নারীর মনে বাজে একটি গানের সুর, যে গানের কথা ও সুর যেন তার নিজের। গানটি নিম্নরূপ :

> রঙ্গুম রঙিলার সনে মজি রইল মন
> এমন দেওয়ানা রে হইয়া রইল কতজন
> রঙ্গুম রঙিলা রে...।[৮২]

অবশেষে ইসমাইলের সারেং হিসেবে জাহাজে চড়ার দিন-ক্ষণ উপস্থিত হয় সকলে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে জাহাজ ঘাটে যায়। জুলিকে দেওয়া শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও তার মন মানে না। অভাবের সংসারে স্বামীই তার একমাত্র অবলম্বন, তাকে দূর দেশে যেতে দিয়ে সে হবে নিঃস্ব। অসহায় নারী তাই স্বামীর জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা করেই যেন তৃপ্ত : যেখানেই যাক সে যেন আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। স্বামীর প্রতি তার এই অসীম দরদই 'জুলির মত একজন সর্বংসহা প্রেমিক নারীর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের নাড়ির যোগ'[৭৯] ঘটিয়েছে। স্বামীর প্রতি দরদ আর মঙ্গল প্রার্থনার বিপরীতে তার মনে জন্মেছে এক ধরনের অবিশ্বাসও। সে অবিশ্বাস শুধু সারেং ইসমাইলের ওপর নয়। তা সমস্ত সারেংদের ওপরও প্রযোজ্য। তারা বিদেশী 'মেম' বা মেয়ে বিয়ে করে ভুলে যায় দেশের স্ত্রী-সন্তানের কথা। সে অবিশ্বাসের আগুনে জ্বলে জুলি প্রলাপ বকে যেন. সে বলে :

> আর যদি বিয়া গরই. তইলে এ্যান চাই গরিবা যেন্ আঁইও থাইৎ পারি।[৮০]

পতিপ্রাণা বাঙালি নারী হৃদয়ের আকুতি, আজীবন স্বামীর আশ্রয়ে থাকার দীপ্ত বাসনা-এ যেন। জাহাজ ঘাটে সারেংদের বিদায় দেওয়ার জন্যে আত্মীয়রা এসেছে, তারা সকলেই বেদনাক্রান্ত। তাদের কান্না বিজড়িত ভাব-ভাষায় ভারী হয়ে গেছে জাহাজঘাটের বাতাস। এমন পরিস্থিতিতে ভেঁপু বাজে জাহাজের। সারেংদের বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা জাহাজ থেকে নেমে যায়। জাহাজ থেকে নামতে হয় জুলিকেও, সে যেন নামতে চায় না। যেতে চায় সে স্বামী ইসমাইলের সঙ্গে। তার মনে জাগে নারী জন্মের সীমাদ্ধতার কথা। নারীর বিচরণের স্থান যেন ঘর সংসারই। সে যদি জাহাজে যেতে পারত, দেখত নতুন দ্বীপ, পাখির ঝাঁক, কত বাজার-বন্দর আর মানুষ। পাহাড়ী-উড়িয়া মেয়েদের স্বাধীন চলাচলের সঙ্গে তুলনা করে নিজ অবস্থার। তারা হাট-বাজারে শ্রম বিক্রি করে, অর্থ উপার্জন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে তারা স্বাবলম্বী। তাতে তাদের সতীত্ব যায় না। জুলির কথায়, সতীত্ব নিজে না হারালে তা নষ্ট হয় না। সে ভাবে নারী হয়ে জন্মানোর অভিশাপের কথা। আসলে, নারী বা পুরুষ জন্মের বিষয়টি মুখ্য নয়, পরিস্থিতিটা নির্ভর করে সমাজের ওপর, সমাজের মানুষের ওপর। সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে নারী স্বাধীনতাও হবে নিশ্চিত। তার মনের গুমোট বাঁধা বেদনার ভাষা যেন ছড়িয়ে যায় দূর সমুদ্রের দিগন্তে :

> তার দুই চোখের অবিরল অশ্রুধারা কর্ণফুলীর প্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছে একটি রেখায় জীবন্ত ফিতার মতো... সামনে শুধু নীল আসমান, আর থই থই দরিয়া। কূলকিনারাহীন. অনন্ত।[৮১]

অবসন্ন, বিষণ্ন, বিরহ কাতর এই নারীর মনে বাজে একটি গানের সুর. যে গানের কথা ও সুর যেন তার নিজের। গানটি নিম্নরূপ :

> রঙ্গুম রঙিলার সনে মজি রইল মন
> এমন দেওয়ানা রে হইয়া রইল কতজন
> রঙ্গুম রঙিলা রে...।[৮২]

অবশেষে ইসমাইলের সারেং হিসেবে জাহাজে চড়ার দিন-ক্ষণ উপস্থিত হয়. সকলে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে জাহাজ ঘাটে যায়। জুলিকে দেওয়া শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও তার মন মানে না। অভাবের সংসারে স্বামীই তার একমাত্র অবলম্বন, তাকে দূর দেশে যেতে দিয়ে সে হবে নিঃস্ব। অসহায় নারী তাই স্বামীর জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা করেই যেন তৃপ্ত : যেখানেই যাক সে যেন আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। স্বামীর প্রতি তার এই অসীম দরদই 'জুলির মত একজন সর্বংসহা প্রেমিক নারীর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের নাড়ির যোগ'[৭৯] ঘটিয়েছে। স্বামীর প্রতি দরদ আর মঙ্গল প্রার্থনার বিপরীতে তার মনে জন্মেছে এক ধরনের অবিশ্বাসও। সে অবিশ্বাস শুধু সারেং ইসমাইলের ওপর নয়। তা সমস্ত সারেংদের ওপরও প্রযোজ্য। তারা বিদেশী 'মেম' বা মেয়ে বিয়ে করে ভুলে যায় দেশের স্ত্রী-সন্তানের কথা। সে অবিশ্বাসের আগুনে জ্বলে জুলি প্রলাপ বকে যেন, সে বলে :

> আর যদি বিয়া গরই, তইলে এ্যান চাই গরিবা যেন্ আঁইও থাইৎ পারি।[৮০]

পতিপ্রাণা বাঙালি নারী হৃদয়ের আকুতি, আজীবন স্বামীর আশ্রয়ে থাকার দীপ্ত বাসনা-এ যেন। জাহাজ ঘাটে সারেংদের বিদায় দেওয়ার জন্যে আত্মীয়রা এসেছে, তারা সকলেই বেদনাক্রান্ত। তাদের কান্না বিজড়িত ভাব-ভাষায় ভারী হয়ে গেছে জাহাজঘাটের বাতাস। এমন পরিস্থিতিতে ভেঁপু বাজে জাহাজের। সারেংদের বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা জাহাজ থেকে নেমে যায়। জাহাজ থেকে নামতে হয় জুলিকেও, সে যেন নামতে চায় না। যেতে চায় সে স্বামী ইসমাইলের সঙ্গে। তার মনে জাগে নারী জন্মের সীমাদ্ধতার কথা। নারীর বিচরণের স্থান যেন ঘর সংসারই। সে যদি জাহাজে যেতে পারত, দেখত নতুন দ্বীপ, পাখির ঝাঁক, কত বাজার-বন্দর আর মানুষ। পাহাড়ী-উড়িয়া মেয়েদের স্বাধীন চলাচলের সঙ্গে তুলনা করে নিজ অবস্থার। তারা হাট-বাজারে শ্রম বিক্রি করে, অর্থ উপার্জন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে তারা স্বাবলম্বী। তাতে তাদের সতীত্ব যায় না। জুলির কথায়, সতীত্ব নিজে না হারালে তা নষ্ট হয় না। সে ভাবে নারী হয়ে জন্মানোর অভিশাপের কথা। আসলে, নারী বা পুরুষ জন্মের বিষয়টি মুখ্য নয়, পরিস্থিতিটা নির্ভর করে সমাজের ওপর, সমাজের মানুষের ওপর। সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে নারী স্বাধীনতাও হবে নিশ্চিত। তার মনের গুমোট বাঁধা বেদনার ভাষা যেন ছড়িয়ে যায় দূর সমুদ্রের দিগন্তে :

> তার দুই চোখের অবিরল অশ্রুধারা কর্ণফুলীর প্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছে একটি রেখায় জীবন্ত ফিতার মতো... সামনে শুধু নীল আসমান, আর থই থই দরিয়া। কূলকিনারাহীন, অনন্ত।[৮১]

অবসন্ন, বিষণ্ন, বিরহ কাতর এই নারীর মনে বাজে একটি গানের সুর, যে গানের কথা ও সুর যেন তার নিজের। গানটি নিম্নরূপ :

> রঙ্গুম রঙিলার সনে মজি রইল মন
> এমন দেওয়ানা রে হইয়া রইল কতজন
> রঙ্গুম রঙিলা রে...।[৮২]

কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ, প্রতিবেশ, প্রকৃতি নিয়ে লেখা উপন্যাস 'কর্ণফুলী' সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কল্লোলিত কর্ণফুলী তীরবর্তী জনপদ, তার বুকে ভেসে-চলা মাঝি সম্প্রদায়, কর্ণফুলী তীরবর্তী জনপদ বিশেষ অঞ্চলের মাটি আর মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ — সবকিছু এ উপন্যাসে একাত্ম হয়ে গেছে।[৮৩]

তা যেন, 'বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের শিল্পিত শব্দরূপ।'[৮৪]

কর্ণফুলী উপন্যাসে কামার, শ্রমিক-মজুর, পকেটমার, সারেং, ঘটক, চোরাকারবারি, মাঝি, কাপড়ের ফেরিওয়ালার মতো পতিতাদেরও রয়েছে উপস্থিতি। তা ছাড়া দরগাহ্ ফকির তাবিজ-কবজসহ মানুষের লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গও আছে উপন্যাসে।

কর্ণফুলী উপন্যাসে আছে একটি পতিতালয়ের বিবরণ। প্রসঙ্গটি উপন্যাসে এসেছে রমযানের পতিতালয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। পতিতাবৃত্তি সামাজিক সমস্যা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষুধা আর অশিক্ষা। স্বেচ্ছায় কেউ আসে না এই কাজে। বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হয়েই নারীরা আসে পতিতাবৃত্তিতে। পতিতালয়ের প্রধান নারীকে বলা হয় নানি। সে পতিতালয়ে আসা 'খদ্দের'-এর ভালোমন্দের খোঁজ নেয়। খদ্দেরের জন্যে নানি সিগারেট, মদসহ অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থা করে। রমযান নারগিস নামের এক নির্দিষ্ট পতিতার সান্নিধ্যে যায়। তার পতিতা সংসর্গ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> রমযানের কামলিপ্সা যেন উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই চরিত্র স্খলনের এক অন্ধকার গলিপথ।[৮৫]

পতিতাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের সম্পর্কে রমযানের জন্মেছে অনেক অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে রমযান বলে :

> ...গাঁটের পয়সা খরচ করেও এমন ব্যবহার পাওয়া, সত্যি মগজে খুন চাপবার কথা। কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। সে বেরিয়ে গেলে আসবে অন্যজন, শুধু এই তফাৎ। এতদিন ভালোরকমেই বুঝতে পেরেছে ওদের হাস্য লাস্য ঠাকঠমক কেবল শিকার আকর্ষণ করবার জন্য ; কিন্তু বড়শিতে কেউ বিঁধে গেলে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে শামুকের মতো, এরপর শুধু নিরস খোলসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা। তাতে কোন সুখ নেই। বহুদিন হতে চলল, টাকা কম ঢালে নি। কিন্তু ওর মনের এতটুকু ছোঁয়া কোনদিন অসতর্ক মুহূর্তেও পেয়েছে বলে স্মরণ নেই। তবে, কেন ছাড় দেয় না ? দিতে কি পারে না ? পারে নিশ্চয় পারে। কিন্তু তবু দেবে না। কারণ, নারীর মন একটা বাজে গুজব, টাকা দিয়ে মেলে দেহ, জলজ্যান্ত, নরম-কোমল, আর তাকে পীড়ন করে যে জান্তব আনন্দ সেটাই তো আসল দামী ?[৮৬]

পতিতালয়টি শহরের অদূরে অবস্থিত। রমযানের সঙ্গে থেকে ইসমাইলও চিনেছিল জায়গাটি। সে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে যেতে চেয়েছিল পতিতা নারগিসের কাছে। শেষ পর্যন্ত যায় নি। হয়তো তার মনে পড়েছিল জুলির কথা। উপন্যাসে জুলিকে

কেন্দ্র করেই আসে ফকিরের প্রসঙ্গ। কেরামতের মেয়ে জুলির বিয়ে প্রায় পাকা করেছিল বিপত্নীক পাত্রের সঙ্গে। সে বিয়েতে জুলির মত ছিল না, মত ছিল না মানুবিবিরও। জুলি ভালোবাসে ইসমাইলকে, আর মানুবিবিরও ইচ্ছা তার ছেলে ইসমাইলের সঙ্গে জুলির বিয়ে হোক। এমন পরিস্থিতিতে ইসমাইল পাহাড়তলী এলাকায় ছিল না। সে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ফুলছড়ি। জুলির অমতে অপাত্রে বিয়ে হওয়া ঠেকাতে প্রয়োজন হয় ইসমাইলের। তাকে খবর দেওয়ার জন্যে মানুবিবি অনেকের কাছে অনুরোধ করে। অবশেষে আবু কে পাওয়া গেলেও, ফুলছড়িতে ইসমাইলকে খবর দেওয়ার জন্য যাদের অনুরোধ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ফকির সওদাগর ছিল একজন। সে ফুলছড়ি-কাসালংকে ভয়ঙ্কর স্থান বলে অভিহিত করে। সে মানুবিবিকে এই বিপদের সময় সাহায্য করতে চায় নি, পরদিন সকালে সে সিলেট শাহজালালের দরগায় যাওয়ায় অজুহাতে। মানুবিবি সওদাগর ফকিরের সঙ্গে কথায় বুঝতে পারে তার 'ভড়ংটাই সার'। মানুষের বিপদে সহায় না হয়ে কেউ দরগায় গেলে তাতে কোন লাভ হবে না, মানুবিবি বলে :

> মাইন্‌ষের উপকার তন দরগাৎ যাওন বড় হইল ? যা তইলে দরগাৎ যা। তোর কিচ্ছু ন অইব।[৮৭]

বিয়ের পর ইসমাইলও স্ত্রী জুলিকে নিয়ে মাজারে গিয়েছিল। সেখানে তারা মোমবাতি কিনে দেয়, মোনাজাত করে পুত্র সন্তান লাভের জন্য। বায়েজিদ বোস্তামীর দরগায় গিয়ে তারা যেমন সহজ ভাবে পুত্র সন্তান লাভের প্রার্থনা করে, তেমনি করেই তারা বিপদ-আপদ দূর করতে অশ্রয় নেয় ফকিরের দেওয়া তাবিজ-কবজের। অসহায়তা বা অজ্ঞতার কারণেই মানুষ নির্ভর করে এই সব অতিপ্রাকৃত উপাদানের ওপর। মানুবিবি কানু ফকিরের কাছ থেকে তদ্‌বির নেয়, যে তদ্‌বিরের গুণে ইসমাইল সারেং হয়ে দূর দেশে যাবে না। থাকবে সে নিজ বাড়ি-ঘরে, স্ত্রী-সন্তান, মায়ের সান্নিধ্যে। কানু ফকিরের আস্তানা প্রসঙ্গে উপন্যাসে উল্লেখ আছে :

> একটা টিবির মাঝামাঝিতে কানু ফকিরের আস্তানা। বাঁশের বেড়া, কেরোসিনের টিন কেটে তৈরী ছাউনি : ঘরের সামনে টিলার ওপর মোম জ্বলে, সন্ধের সময় থেকে নিয়ে সারারাত। দূর থেকে মনে হয় এ যেন একটা উঁচু কবর।[৮৮]

অজ্ঞানতা, অশিক্ষায় ভরা বস্তিবাসীদের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি বা বিজ্ঞান চেতনা ছিল না, তারা অন্ধ বিশ্বাসী। সে বিশ্বাসেই তারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে পারে ফকিরের দরগায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> কি জবরদস্ত আদমি ! আর কি গলার আওয়াজ ! জুলির দিল-কলজে নড়ে ওঠে। সে গাঁট থেকে খুলে একটাকা সাড়ে পাঁচ আনার পয়সা তাঁর পায়ের কাছে রাখল।[৮৯]

ফকিরের বলে দেওয়া নিয়ম অনুসারে তাবিজ ব্যবহার করতে হয়। জুলি সে অনুযায়ী তাবিজটি ব্যবহার করে। গভীর রাতে 'সাফ' কাপড়ে খোলাচুলে খান বাড়ির পুকুর পাড়ের ডালিম গাছে বেঁধে আসে সেটি। রাত পোহানোর আগে তাবিজ বাঁধা শাখাটি ঝড়ে কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে গেলে অনিবার্যভাবে মৃত্যু হবে তার :

যার নামে তাবিজ করা হয়েছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে জুলি ও মানুবিবি যথার্থ ফলাফল পায় না। ইসমাইল নির্দিষ্ট দিনে জাহাজের সারেং হয়ে চলে যায় দূর দেশে।

উপন্যাসে 'প্যাঁচার ডাক'-এর অমঙ্গলের লোকবিশ্বাসটিও এসেছে জুলির বিয়ে-প্রসঙ্গে। ইসমাইলকে আনতে আবুকে কাসালং পাঠিয়ে মানুবিবি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে ভেবেছিল, ইসমাইল এলে অপাত্রে ঠিক করা জুলির অমতের বিয়ে ভাঙবে; তখন ইসমাইলের সঙ্গে দেবে জুলির বিয়ে। জুলি হবে মানুবিবির পুত্রবধূ। নিস্তব্ধ রাতে মানুবিবির এ ভাবনায় আঘাত করে একটি পাখির ডাক। উপন্যাসে আছে :

> কামরাঙা গাছের ঝাকড়া ডালের মধ্যে বসে লক্ষ্মীছাড়া প্যাঁচাটা আবার ডেকে উঠল,
> কু-উপ্! কু-উপ্! কু-উপ্।[১০]

অলুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়া প্যাঁচার ডাক শুনে তাকে পোড়াকাঠ মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে সে। একই সময় ইসমাইলও এই অলুক্ষণে প্যাঁচার ডাক শুনেছিল। সে গিয়েছিল লালচাচার ঘরের পাশে, রাঙামিল্যার উদ্দেশে। তখন ঘরের পাশের আম গাছের ডালে বসা প্যাঁচার ডাকে ভাঙে রাত্রির নীরবতা। ইসমাইল অবশ্য সে ডাকে আমল দেয় নি। একই সময়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ডাকা প্যাঁচার ডাক তাদের দু জনকে অমঙ্গল সঙ্কেত জানিয়ে দেয় যেন। তাতে লোকবিশ্বাসের সীমানা ছাড়িয়ে যায় বহুদূর।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে একদিকে, কর্ণফুলী নদী বিধৌত চট্টগ্রামের সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত জনপদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে এই সুদীর্ঘ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও নিপুণ চিত্র এঁকেছেন অকৃত্রিম দরদে।

তথ্যপঞ্জি

১. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, (৫ম সং), ঢাকা, ১৯৯৬

২. সিকদার আব্দুল বাসার (সম্পা.), আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫২

৩. সৈয়দ মাজহারুল হক, বাংলাদেশের নদী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫

৪. মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের নদ-নদীর ইতিকথা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬১

৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *কর্ণফুলী*, সম্পা., সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ধান শালিকের দেশ, ২৫ বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, পৃ. ৭৯

৬. খালেদা এদিব চৌধুরী, *বাংলাদেশের নদী ও সাহিত্য*, সম্পা., মিজানুর রহমান, নদী সংখ্যা : ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২৩৩

৭. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদী ও জীবন*, সম্পা., সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ধান শালিকের দেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, (৫ম সং), ঢাকা, ১৯৯৬ : ভূমিকাংশ।

---

৯. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী (১ম সং), ঢাকা, ১৯৬২ : লেখকের কথা।
১০. সৈয়দ আলী আহসান, *শীতলক্ষ্যা*, মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের নদ-নদীর ইতিকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
১১. মোকারম হোসেন, বাংলাদেশের নদী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৭২
১২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
১৩. মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, *আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস*, আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন ও সাহিত্য, সম্পা., আবুল বাসার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫২
১৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
১৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
১৭. ঐ, পৃ. ৯
১৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
১৯. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
২০. ঐ, পৃ. ১২
২১. সৈয়দ সরওয়ার, ৬ই মে তাঁর জন্মদিনে আমাদের অভিনন্দন, আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর জেগে থাকা, দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী, ৫মে, ২০০০
২২. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদী ও জীবন*, সম্পা., সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ধান শালিকের দেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
২৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
২৪. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭
২৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
২৬. রশীদ আল ফারুকী, বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৪
২৭. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
২৮. সরদার ফজলুল করিম (সম্পা.) আমাদের সাহিত্য, আতোয়ার রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৬
২৯. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১২৭
৩০. গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৯
৩১. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৩২. ঐ, পৃ. ৪৭
৩৩. ঐ, পৃ. ৪৮
৩৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৩৫. ঐ, পৃ. ৪৭
৩৬. ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪
৩৭. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
৩৮. ঐ, পৃ. ৩৬

৩৯. আহমেদ মাওলা, বাংলাদেশের কথা সাহিত্য প্রবণতাসমূহ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২১
৪০. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২
৪১. আব্দুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৭৯-৮৯
৪২. গিয়াস শামীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
৪৩. ঐ, পৃ. ২৯
৪৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
৪৫. ঐ, পৃ. ৭২
৪৬. ঐ, পৃ. ৩৬
৪৭. ঐ, পৃ. ৫০
৪৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
৪৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯২
অরূপকুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা, বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৯
মুহম্মদ ইদরিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭
৫২. সরদার ফজলুল করিম (সম্পা.) আমাদের সাহিত্য, আতোয়ার রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৭
৫৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
৫৪. রবিন পাল, উপন্যাসের উজানে, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১২৪
৫৫. রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৪
৫৬. শাহিদা আখতার, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮৩
৫৭. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
৫৮. ঐ, পৃ. ৮০
৫৯. ঐ, পৃ. ৮০
৬০. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, সাহিত্যের সামাজিকতা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯০
৬১. সরদার ফজলুল করিম (সম্পা.) আমাদের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
৬২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রেণী সময় ও সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩০
৬৩. মাহফুজ পাভেজ, শিল্পের হিরন্ময় দ্যুতি, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৬৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৬৫. ঐ, পৃ. ৬১
৬৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
৬৭. ঐ, পৃ. ৮৫
৬৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৬৯. ঐ, পৃ. ৮৭
৭০. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
৭১. ঐ,পৃ. ৮৯
৭২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

---

৭৩. গিয়াস শামীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
৭৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৭৫. ঐ, পৃ. ৯৬
৭৬. ঐ, পৃ. ৯৯
৭৭. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১২৭
৭৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪
৭৯. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস . পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬
৮০. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬
৮১. ঐ, পৃ. ১০৭
৮২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
৮৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২২
৮৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ??
৮৫. মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা বিভাগোত্তর কাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
৮৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৮৭. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৮৮. ঐ, পৃ. ১০১
৮৯. ঐ, পৃ. ১০১
৯০. আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮